করুণাময়ী

রাণী রাসমণি

মহামায়া দেবী

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫।১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ কলেজ রো,
কলিকাতা—৯

দ্বিতীয় প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ ঃ সব্যসাচী দাসগুপ্ত

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীহরিনারায়ণ দে
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৫।১এ, কালীদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯

॥ এক ॥

দরিদ্র পরিবারে জন্মালেও মা রামপ্রিয়া আদর করে মেয়ের নাম রাখেন রাণী। সত্যিই যেন রাণী হতে জন্মেছেন তিনি। মেয়ে তো সকলেরই আছে। তাঁদের মতো এত লক্ষ্মী মেয়ে ক'জনের হয়।

ঘর আলো করা মেয়ে। আকাশে চাঁদ বুঝি সেদিন তাদের কুঁড়ে ঘরে নেমে এসেছিল। সুন্দর সুশ্রী তাঁর মুখশ্রী। সুনিপুণ দেহের গঠন। ফর্সা গায়ের রঙ।

মা'র দেওয়া রাণী নামটি পরে মেয়ের জীবনে আশ্চর্যভাবে মিলে গিয়েছিল। তখন কে ভেবেছিল গ্রামের এই শিশুকন্যা বাঙলার আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো শোভা পাবে। জন-জীবনে জনপ্রিয় হবেন তিনি।

রাণী ছাড়াও শিশুকন্যার আর একটি নাম রাখা হয়েছিল, রাসমণি।

রাসমণি পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন না। তাঁর বড় দু'ভাই ছিল। রামচন্দ্র ও গোবিন্দ। এই দু'টি পুত্র-সন্তান জন্মাবার অনেক দিন পরে, পিতা হরেকৃষ্ণ দাসের ঘরে, রামপ্রিয়ার কোলে এলেন রাসমণি।

বৃদ্ধ বয়সে এই সুন্দরী শিশু-কন্যাকে পেয়ে পিতামাতার আর আনন্দের সীমা রইল না। খুব কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটছিল হরেকৃষ্ণর।

তিনি জাতে ছিলেন মাহিষ্য। তিনি লোকের ঘর বেঁধে চাষ-আবাদ করে কোনরকমে দিন চালাতেন। অভাবের অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন খুব। গ্রামের লোকেরা তাকে হারু ঘরামি বলেই ডাকত।

জীবিকার জন্য তো খাটতে হতই। এ ছাড়া মানুষের সেবায় কম পরিশ্রম করতেন না তিনি। কারোর উপকারের জন্য গায়ে খাটতে তাঁর কার্পণ্য ছিল না।

রাসমণি ঘরে আসার পর, পিতার সাংসারিক অবস্থাও একটু ভালোর দিকে যায়। মেয়ে তাঁর লক্ষ্মী। মেয়ের প্রতি তাঁর স্নেহের মাত্রাও বেড়ে যায়। সংসারে একটা খুশীর স্রোত বইতে থাকে।

কতদিনকার আগেকার কথা এসব। রাসমণির পবিত্র জীবন-আজও মানুষের মুখে মুখে শুনা যায়।

সেদিনটি ছিল বুধবার, ১১ই আশ্বিন, ১১০ বঙ্গাব্দ। শরতের শিউলী ফুল ফুটে আছে গাছে গাছে। পদ্ম প্রকৃতির সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। পূজার আনন্দে প্রতি মানুষ মনে মনে পুলকিত। মণ্ডপে মণ্ডপে মূর্তি গড়ার তাগিদ পড়ে গেছে।

একটি শুভলগ্নে পৃথিবীর মাটিতে জন্ম নিলেন রাসমণি। হালি-সহরের কাছে কোনা গ্রামের এক কোণে, একটি ছোট্ট কুটিরে। হালিসহর সাধক কবি রামপ্রসাদের জন্মস্থান। আর এক মহাপ্রাণের পিঠস্থান হলো এখানে। কোনা গ্রামও খুব ছোটো ছিল তখন। গঙ্গার পূর্ব উপকূলে কোনা গ্রাম অবস্থিত।

পিতামাতার স্নেহনীড়ে একটু একটু করে বড় হতে থাকেন রাসমণি। ছোট্ট বালিকার আচার আচরণে শুধু পিতামাতা নয়, পাড়া প্রতিবেশিরাও খুব খুশি হয়। ছোটো রাসমণি সেদিনই সকলের মন জয় করে নেয়। আদর কেড়ে নেয়।

রাসমণির প্রশংসা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পাড়ার যে কোনো নারী-পুরুষ রাস্তায় হরেকৃষ্ণকে দেখলেই তাঁর মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করে। শান্ত, নম্র, ফুটফুটে এই সুন্দর মেয়েটি কোনা গ্রামের অনেকের মনের রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

রাসমণি না ডেকে অনেকেই তাঁকে রাণী বলেই ডাকতেন। ছোটো নাম তার উপর রাণীর মতই দেখতে হয়েছেন। কেউ কেউ

আঅও আদর করে রাণু বলেও ডাকতেন। পাড়ার সেরা মেয়ে। সেরা সুন্দরী। সেরা গুণবতী।

সংসারের প্রতি তাঁর একটা অকৃত্রিম টান ছোটবেলাতেই দেখা গেছে। সঙ্গীদের সঙ্গে কখনও তিনি ঝগড়া করেন নি। সর্বদা সর্বক্ষণের জন্য তাঁর মুখে হাসি লেগে থাকতো। তার মিষ্টি ব্যবহারে কেউ তার ওপর কোনদিন রাগ করতে পারেনি। বাবা-মা পর্যন্ত তাঁকে কড়া কথা বলবার সুযোগ পাননি।

সুযোগ তাঁরা পাবেন কেন ?

সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও রাসমণি তো গাঁয়ের আর পাঁচটা মেয়ের মতো সাধারণ মেয়ে ছিলেন না। বুদ্ধি আর বিবেচনায়ও তিনি ছিলেন গাঁয়ের সেরা মেয়ে।

ধর্ম-আলোচনা, ধর্মকথা শুনবার প্রতি প্রধান আকর্ষণ ছিল তাঁর। ওই বয়সে মেয়েরা সাধারণতঃ খেলাধূলায় মেতে থাকেন, কিন্তু রাসমণি মা'র পাশে পাশে থেকে তাঁর কচি হাতে মাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করেছেন।

কোনো কিছু চাওয়ার তাগিদ ছিল না তাঁর। তাঁরা গরীব। বাবার সামান্য আয়। অভাবের সংসারে ভালো জামা-কাপড় চেয়ে বাবা মা'র মনে তিনি কষ্ট দেননি একদিনও।

ভাবতে অবাক লাগে। উত্তর জীবনে যিনি বাংলার একজন ঐশ্বর্যশালিনী মহিলা হয়েছিলেন তাঁর বাল্যজীবন কত দারিদ্র্যতার মধ্যে কেটেছে। দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জুটেছে মাত্র। সখ করে সুন্দর ফ্রক গায়ে দিতে পারেন নি একদিনও। তারজন্য বুদ্ধিমতী মেয়ে রাণীর দুঃখ ছিল না একটুকু।

হরেকৃষ্ণ ও রামপ্রিয়া দু'জনেরই ধর্মের ওপর ভীষণ বিশ্বাস ছিল। তাঁরা গভীর ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বিষ্ণুর পূজারী। বিষ্ণুর ভক্ত।

পিতামাতাকে দেখে দেখে, ছোট বেলা থেকে মেয়েটির মনে

ভগবানের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার বীজ দানা বাঁধতে থাকে। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনতে তাঁর কত আগ্রহ। এক এক সময় তাঁকে দেখে বৈষ্ণববালা বলে ভুল হতো। বৈষ্ণবদের মতো তিলক কেটে, মালা পরতে পেলে শিশু রাসমণির আর আনন্দের সীমা থাকতো না। কিশোরী কন্যাকে বৈরাগিণীর বেশে দেখাতও বেশ।

মেয়ের পূজা-আচারের এই ঝোঁক কারোর দৃষ্টি এড়ায়নি। পাড়া-প্রতিবেশীরা মুগ্ধ হয়ে মেয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। সাক্ষাৎ গোলকের লক্ষ্মী যেন মর্তে নেমে এসেছে। হরেকৃষ্ণর আর কোন দুঃখ থাকবে না।

কন্যার এই প্রশংসায় হরেকৃষ্ণর গর্বের অন্ত ছিল না। মেয়ে রাসমণির সুখ্যাতিতে আনন্দে ভরে উঠে মা'র বুক। তিনি কন্যাকে কোলে তুলে নেন। স্নেহের আবেগে কন্যার কচি অধরে চুম্বন করতেন তিনি। ভগবানের কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতেন, তাঁর এই মেয়ে যেন শতায়ু হয়।

সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায় দিনগুলো কাটছিলো বেশ।

কিন্তু বেশিদিন আর এইভাবে কাটলো না। আকস্মিক বজ্রপাতের মতই এই সংসারে একদিন বজ্রপাত হলো। সুখের সংসারে শোকের বান ডাকলো। এ শোকের সীমা নেই। শেষ নেই। এ ক্ষতির পূরণ নেই। অন্ত নেই।

রাসমণির বয়স তখন বছর সাতেক হয়তো হবে। হঠাৎ জ্বরে পড়লেন রামপ্রিয়া। জ্বর তো কত. লোকেরই হয়। অসুখ তো মানুষের নিত্য সঙ্গী।

কিন্তু মাত্র আটদিনের জ্বরে ঘটলো এক চরম দুর্ঘটনা। এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের মতো বিদায় নিলেন রামপ্রিয়া। তাঁর কর্ম-চঞ্চল দেহটা নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো নীরব হয়ে গেল। চোখ বুজে যেন কালনিদ্রায় শুয়ে আছেন সতীলক্ষ্মী রামপ্রিয়া। স্বামীর

কোলে মাথা রেখে মরা নারীর যে কি সুখ, কি শান্তি রামপ্রিয়া তা অনুভব করেছিলেন মরার মুহূর্তে।

মার উপর নির্ভরশীল বালিকার মনে গভীর দুঃখের ছাপ পড়ল। রাসমণি খুব কাঁদলেন মার জন্য। এই করুণ কান্নায় সেদিন অনেকের চোখের পাতাই ভিজে গিয়েছিল। প্রতিবেশীরা প্রবোধ দেন—কারোর মা'ই চিরদিন থাকেন না। তিনি স্বর্গে গেছেন। ভগবানের ডাক পড়লে এমনি করে সকলেরই চলে যেতে হবে।

পিতা সান্ত্বনা দেন কন্যাকে। মা গেলেও তিনি তো আছেন।

মা হারানো মেয়ের মন থেকে মায়ের অভাব দূর করতে হবে।

কন্যার সুখের জন্য খুব ব্যাকুল হয়ে ওঠেন হরেকৃষ্ণ। আদরে স্নেহে বড় করতে লাগলেন তিনি রাসমণিকে। পিতা হয়ে সঙ্গীর মতই সর্বদা তিনি কন্যার পাশাপাশি থাকতেন।

॥ দুই ॥

ক্রমে রাসমণি বারো বছরে পা দিলেন। যৌবনের পরিবর্তন হয় অনেকটা। এই বয়সেই তিনি সংসারের অনেক কাজ নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন। পাকা গৃহিণীর মতই কর্তব্য কর্মগুলো তিনি করতেন নিজ হাতে।

গঙ্গায় রোজই স্নান করতে যেতেন রাসমণি। গঙ্গার ওই পবিত্র সলিলে স্নান না করলে তাঁর মন তৃপ্ত হতো না। জল তো কতই রয়েছে। পাড়ায় পুকুরের অভাব নেই। বেশি হাটতে হয় না। বাড়ির কাছেই একটা পুকুর ছিল। কিন্তু গঙ্গায় যাওয়া তাঁর বন্ধ হয়নি এক দিনও।

একা অবশ্য কখনও আসতেন না গঙ্গার ঘাটে। গ্রামের মেয়ে।

খারাপ দেখতে লাগে সেটা। তা ছাড়া সঙ্গীর সংখ্যা তো কম ছিল না তাঁর। রাসমণি বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গায় আসতেন স্নান করতে। জল ছিটিয়ে খেলাও করতেন জলের মধ্যে।

এক একদিন এই জলকেলীতে এমন আত্মহারা হয়ে যেতেন যে কোনদিকে খেয়াল থাকতো না। সময়ও অনেক বয়ে যেতো। একদিন রাসমণি তার সঙ্গীদের সংগে গঙ্গায় স্নান করতে এসেছেন। এই সময় জল পথে কোনাপল্লীর পাশ দিয়ে ত্রিবেণীতে যাচ্ছিলেন রাজচন্দ্র দাস।

কলিকাতার জানবাজারের প্রবল-প্রতাপ জমিদার প্রীতরাম দাসের পুত্র তিনি। খুব ধনী তাঁরা। রাজচন্দ্র পর পর দু'বার বিয়ে করেন। প্রথমা স্ত্রী পরমা সুন্দরী ও গুণবতী মহিলা ছিলেন। দেবকন্যার মতো ছিল তার রূপ। তার প্রমোদ-উদ্যানে পদ্ম ফুলের মতই শোভা পাচ্ছিলেন তিনি।

রাজচন্দ্রের আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরোবার মনস্থ করেন। কিন্তু বেশিদিন এই সুখ তাঁর ভাগ্যে টিকলো না। তাঁর প্রথমা স্ত্রী মারা গেলেন। রাজচন্দ্রের প্রমোদ-উদ্যান ম্রীয়মান হয়ে পড়ে। মধু বিনা ভ্রমরের নৃত্য তো হয় না।

পিতা প্রীতরাম শোকাচ্ছন্ন পুত্রের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। পুত্রের পুনরায় বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। চারদিকে ঘটক ছুটতে সুরু করলো। দ্বিতীয়া স্ত্রী ও যখন রাজচন্দ্রের মারা গেলেন, তখন তিনি নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করতে লাগলেন। প্রিয়তমার সান্নিধ্য হয় তো তার ভাগ্যে নেই।

দ্বিতীয়া স্ত্রী মারা গেলে প্রীতরাম পুত্রকে তৃতীয়বার বিয়ে করতে বললেন। তিনি নিজে পুনরায় রাজচন্দ্রের বিবাহের চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি পুত্রকে কিছুতেই পুনরায় বিবাহে রাজী করাতে পারছিলেন না। এবার বেঁকে বসেছিলেন রাজচন্দ্র।

একটা ভ্রান্ত ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী-ধন

তাঁর ভাগ্যে নেই। তিনি বিপত্নীক থাকবেন বরাবর। জমিদারী কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবেন সর্বক্ষণ।

ত্রিবেণী তীর্থে প্রায়ই স্নান করতে আসতেন রাজচন্দ্র। গঙ্গাবক্ষে নৌকা ভ্রমণ হতো এই উপলক্ষ্যে। ফুরফুরে হাওয়া আর নৌকার মৃদু কম্পন তাঁর বেশ ভালই লাগতো। এক এক সময় নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের নিঃসঙ্গতার কথা ভেবে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন রাজচন্দ্র।

এই দীর্ঘ জীবনটা একা একা কি করে কাটাবেন? তাঁর তো অভাব নেই কোনো কিছুর—ধন-দৌলত, লোক-জন সব কিছুই রয়েছে তাঁর। শুধু নেই একজন মনোরমা প্রেয়সী। প্রেমের সৌরভ থেকে কি সে চিরদিন এই ভাবে বঞ্চিত থাকবে।

ভাবতে ভাবতে এক একদিন রাজচন্দ্র স্মৃতির সমুদ্রে তলিয়ে যান। পৃথিবীটাকে তাঁর খুব নির্মম বলে মনে হয়। ভাগ্যের এই বিড়ম্বনা থেকে কি তাঁর নিস্তার নেই?

নৌকা থেকে রাজচন্দ্র এবার রাসমণিকে দেখতে পেলেন। তাঁর অন্তর মুহূর্তের জন্য আন্দোলিত হয়ে উঠলো।

রাসমণির এদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি তখন স্নান করছিলেন।

অপরিচিত এই গ্রাম্যবালাকে মনে মনে ভালবেসে ফেললেন রাজচন্দ্র। ত্রিবেণী থেকে ফিরে গিয়ে পিতাকে জানালেন মনের ইচ্ছা। ওই মেয়েটিকে পেলে তিনি পুনরায় বিবাহ করতে প্রস্তুত আছেন। পুত্রের বিবাহে মত হয়েছে জেনে পিতা খুব খুশী হলেন। প্রীতরাম লোক পাঠালেন। পুত্রের ইচ্ছাই তাঁর প্রধান হলো। তিনি কন্যার কুল-শীল-মান কিছুই গ্রাহ্য করলেন না।

রাসমণির পিতা হরেকৃষ্ণ দাস এই অসম্ভব প্রস্তাবে প্রথমে হতবাক হয়ে গেলেন। হাতে আকাশ পেলেন তিনি। প্রজাপতির বন্ধন না থাকলে এ বিয়ে সম্ভব হতো না। তাঁর কন্যার প্রতি

ভগবানের কৃপাদৃষ্টি রয়েছে। দেবতার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে জন্মেছেন রাসমণি।

কলকাতার এতবড় নামজাদা ধনী পরিবারের ছেলের সংগে তারই মতো গরীবের মেয়ের বিয়ে! এ কথা ভুলেও কল্পনা করা যায় না। কী অসম্ভব ব্যাপার! কি আশ্চার্য প্রস্তাব।

রাসমণির পিতা খুব গরীব জেনেও, প্রীতরাম শীঘ্রই নিজের ছেলের সংগে তাঁর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠালেন। শুভ-কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন হওয়া উচিত। অযথা দেরী করবার দরকার নেই।

এখানে হরেকৃষ্ণর আপত্তি উঠতেই পারে না। দ্বিরুক্তি না করে পরম আনন্দেই পাত্রপক্ষের প্রস্তাবে তিনি রাজী হলেন। মত দিলেন মেয়ের বিয়েতে। পিতা হিসাবে তাঁর মত ব্যক্ত করার গুরুত্ব আছে।

শুভদিন ধার্য হলো। ৮ই বৈশাখ। সালটা ছিল ১২১১। মহা ধুমধামে, আনন্দ কলরবে রাসমণির সংগে রামচন্দ্র দাসের বিয়ে হয়ে গেল। কন্যাপক্ষ গরীব হলেও পাত্রপক্ষ তো গরীব নয়। জমিদার পুত্রের বিয়ে। বেশ ঘটা করেই বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হলো।

শান্ত, নম্র পল্লী-বালিকা রাসমণি এসে উঠলেন শ্বশুরবাড়িতে। সার্থক হলো তাঁর রাণী নাম। রাজপ্রাসাদের মতো বিশাল অট্টালিকা। জমিদার হলেও প্রীতিরাম দাসের প্রতিপত্তি ছিল রাজার মতই। তদানীন্তন ইংরেজ সরকার তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করতে।

বধূ রাসমণি তাঁর মিষ্টি ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যে স্বামীর মন জয় তো করলেনই, শ্বশুরের চিত্তও জয় করে নিলেন। কিশোরী বধূর সুনাম ছড়িয়ে পড়লো আত্মীয় কুলে। পুত্রবধূর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন প্রীতরাম। রাসমণির সেবা-শুশ্রূষায় তার মন ভরে ওঠে। এইটুকু মেয়ের কর্তব্যবোধে বিস্মিত হতে হয়। এই

প্রাসাদের প্রতিটি মানুষকে রাসমণি তার ব্যবহারে আপন করে নিয়েছিলেন।

রাজচন্দ্র প্রথম ভেবেছিলেন, গাঁয়ের মেয়ে হয়তো ঘরকুনো হবে। তেমন চালাক চতুর নিশ্চয়ই হবে না। ফুলসজ্জার রাতে স্বামীর প্রেমালিঙ্গনে তেমন সাড়া দিতে পারেননি রাসমণি। জড়সড় হয়ে খাটের একপাশে ঘোমটা টেনে বসেছিলেন।

পিতার জন্য মন খুব ছিল চঞ্চল রাসমণির। পিতাকে ছেড়ে আসার সময় চোখের জলে শাড়ীর আঁচল ভিজে গিয়েছিল। বাবার কথা ভাবছিলেন খুব। তাকে ছেড়ে বাবার থাকতে খুব কষ্ট হবে। বাবা সেই চিরদুঃখের মধ্যে পড়ে রইলেন। ভাগ্যের সুপ্রসন্নতায় আজ তিনি ধনীর গৃহিণী, প্রচুর সম্পদের অধিকারিণী!

শ্বশুরবাড়ি এসে রাসমণি আগের চেয়ে আরো বিনয়ী, আরো সেবাপরায়ণা হয়ে উঠলেন। তাঁর সরল ব্যবহারে বাড়ির দাসদাসী পর্যন্ত পরম তৃপ্তিলাভ করলো। তিনি সকলকেই মায়ার বন্ধনে আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রের এটা ছিল একটা মহৎ গুণ। অহঙ্কার তাঁর মনে স্থান পায়নি একবিন্দুও। সর্বদাই তিনি গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকতেন।

রাজচন্দ্র এক একদিন অসময়ে বাড়িতে এসে স্ত্রীকে ডাকতেন। স্বামীর স্নেহ ভালবাসা রাসমণির বড় পাথেয় ছিল। একটি দিনের জন্যও তিনি স্বামীকে অবজ্ঞা করেননি। স্বামীকে যেমন ভালবাসতেন, ভক্তিও করতেন তেমনি।

রাসমণি তাঁর কাজ আর বুদ্ধিতে বাড়ীর সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। রাসমণিকে বাদ দিয়ে কিছুই যেন ভাবা যায় না আর। শ্বশুর-শাশুড়ী রাসমণির খোঁজ করেন প্রতিমুহূর্তে। তিনি ছাড়া কে তাঁদের সেবা করবে, কে তাদের যত্ন করবে? বৃদ্ধ হয়েছেন তারা। পুত্রবধূর ওপর সংসারের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান তাঁরা।

একে একে রাসমণি সবকিছুর দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে টেনে নিলেন।

পাকা গৃহিণী হয়ে উঠলেন তিনি। ঠাকুর পূজোর ব্যবস্থা তিনি করবেন। বাড়িতে অতিথি এলে সেবা, দীনদুঃখীর অভাব দূর করা, সব কাজেই এগিয়ে এলেন রাসমণি।

বিচক্ষণ বুদ্ধিমতী ও গুণবতী গৃহিণী পেয়ে স্বামী রাজচন্দ্রের আনন্দের সীমা থাকে না। শান্তির সুধা তিনি খুঁজে পেয়েছেন। মনে মনে স্ত্রীর প্রতি তিনি খুব অনুরক্ত হয়ে পড়েন। কাজকর্মে নতুন উৎসাহ খুঁজে পান। নতুন আশার আলো দেখতে পান। যে উদাসভাব তাঁর মনে বাঁসা বেঁধেছিল, তা মন থেকে সরে যায়। কুয়াশার মেঘ কেটে গিয়ে সূর্যের রঙিন রশ্মি এসে পড়ে। দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পান। একটা খুশীর আমেজ অনুভব করেন।

॥ তিন ॥

মানুষ মরণশীল। কেউই চিরদিন বাঁচতে এ পৃথিবীতে আসেনি। অমর কেউ নয়। প্রত্যেকটি জীবকেই মৃত্যুর কবলে নিজেকে বলি দিতে হবে। প্রকৃতির এই নির্মম সত্যকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা কারোর নেই। জন্মগ্রহণের পর থেকেই মৃত্যুর জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে হয়। মায়া-মমতার স্থান নেই এখানে। স্নেহের বন্ধন এখানে অচল। একদিন না একদিন তাকে মরতেই হবে। মৃত্যুই মানব জীবনের শেষ পরিণাম।

অর্থের প্রাচুর্য থাকলেও সংসারে একটানা সুখ বা আনন্দের স্রোত বয় না। নিয়মের চাকা ক্রমাগতই ঘুরছে। এ নিয়ম লঙ্ঘন হবার নয়। তাই রাসমণির শ্বশুরবাড়িতে আনন্দের হাট জমে উঠতে না উঠতেই তা ভেঙ্গে গেল। শোকের ছায়া নেমে এল। প্রীতরাম একদিন মারা গেলেন।

মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল চৌষট্টি। বয়স হলেও তাঁর মনোবল ও দৈহিক শক্তি অটুট ছিল। চেষ্টা আর ধৈর্য থাকলে

মানুষ যে কত বড় হতে পারে, তিনি তার জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করে গেছেন। আপন চেষ্টা আর অধ্যবসায় দিয়ে প্রীতরাম সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে বরণ করে নিয়েছেন।

বাংলাদেশে তখন বর্গীর উৎপাত খুব চলছিল। এরা ছিল খুব নিষ্ঠুর স্বভাবের। ইস্পাত দিয়ে হয়তো এদের অন্তর গড়া ছিল নবাব আলীবর্দী খাঁর সময়ে চোথ বা কর আদায় করতে এরা প্রথম বাংলা দেশে প্রবেশ করে। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বাংলার খুব খ্যাতি ছিল। ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা এই বাংলাদেশের প্রতি অনেকেরই প্রলোভন ছিল।

বর্গীরা ছিল দস্যু-ভাবাপন্ন। এই বর্গীরা যে কী ভয়ানক নিষ্ঠুর ছিল তা ভাষায় বলে শেষ করা যায় না। সীমানা অঞ্চলে যমদূতের মতো এরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়তো। এরা নিরীহ প্রজাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিত। শস্যক্ষেত্র তছনছ করে দিত। তাণ্ডব নৃত্যে তখন এদের জোড়া আর কেউ ছিল না। ধন-সম্পত্তি লুঠপাঠ করে নিত। প্রাণের প্রতি এদের কোন মায়া মমতা ছিল না। নানারকমভাবে যন্ত্রণা দিয়ে মানুষকে প্রাণে মেরে ফেলতো।

বর্গীদের অত্যাচারে সারা বাংলাদেশে অভাব, কান্না আর মৃত্যুতে ভরে উঠতো। বর্গী আসছে শুনলেই ভয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য গা-ঢাকা দিত। জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে অন্যত্র পালিয়ে যেত।

সারা দেশের এই দুর্দিনে প্রীতরামও পালিয়ে এলেন তাঁর জন্মভূমি থেকে। হাওড়া জেলার খোষালপুর গ্রামেই তিনি ছিলেন এতদিন। বর্গীর ভয়ে হঠাৎ গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন তিনি। এই আকস্মিক পলায়নের জন্য টাকা-পয়সা সঙ্গে আনতে পারেননি। সঙ্গে দুটি ভাই ছিল। রামতনু আর কালীপ্রসাদ। কলকাতার এই জানবাজারে এসে তাঁরা উঠলেন। তখন প্রীতরামের চরম দুর্দিন। অক্রুর চন্দ্র মান্না মহাশয়ের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিলেন।

মান্না পরিবারের সঙ্গে প্রীতরামের একটু আত্মীয়তা ছিল। তাঁর

পিসিমা বিন্দুবালার বিয়ে হয়েছিল এই বাড়িতে। উদার হৃদয় অক্রুর মান্না শুধু আশ্রয় দিয়ে কর্তব্য শেষ করলেন না। তিনি এঁদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। স্বাবলম্বী হয়ে যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল।

মান্না পরিবারে থেকেই প্রীতরাম লেখাপড়া সুরু করলেন। বাড়ির অভিভাবক অক্রুর মান্না তখন ছিলেন ডানকিন সাহেবের দেওয়ান। সমাজে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি ছিল। অক্রুর মান্নার একটি মহৎ গুণ ছিল, তাঁর অহঙ্কার ছিল না। অনেক লোকের তিনি উপকার করেছেন।

অক্রুর বাবুর সাহায্যেই প্রীতরাম তার ভাগ্য ফেরাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পড়াশুনা শেষ হলে মান্না মশাই একদিন প্রীতরামকে নিয়ে এলেন ডানকিন সাহেবের কাছে। একটা চাকরী করে দিতে হবে এই ছেলেটির। খুব ভালো ছেলে। যেমনি কর্মঠ, তেমনি বুদ্ধিমান। তাছাড়া একটা চাকরী এঁর ভীষণ প্রয়োজন।

বেলেঘাটায় এই সাহেবের লবণের কারখানা ছিল। এখানে অনেক লোক তখন কাজ করতো। এখানেই অল্প মাইনেতে মুহুরীর কাজে নিযুক্ত হলেন প্রীতরাম। সুরু হলো জীবন সংগ্রাম। ভাগ্যে সঙ্গে মোকাবিলা, জয়-পরাজয় অনিশ্চিত।

ক্রমে যশোরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয় প্রীতরামের। ডানকিন সাহেবের চাকরী ছেড়ে দিয়ে এই সাহেবের সাহায্যে ঢাকা সহরে কিছুদিনের জন্য চাকরী করেন তিনি। উত্তর জীবনে যিনি বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হবেন, তিনি কি এক জায়গায় পড়ে থাকতে পারেন? নিজের অবস্থার উন্নতি করার জন্য সর্বদা তিনি সজাগ ছিলেন। তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সুতরাং ক্রমেই তাঁর অবস্থা ভালো হতে থাকে।

অবশেষে ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হলেন। ভাগ্যের পরিবর্তন হলো। নাটোরের মহারাজার দেওয়ান হলেন প্রীতরাম। প্রচুর

অর্থ তিনি আয় করতে শুরু করলেন। অর্থের অভাব দূর হলো তাঁর জীবন থেকে। কয়েক বছর বাদে দেওয়ান পদ থেকে অবসর নিলেন তিনি। আর কারো চাকরি করবেন না বলে মনস্থির করলেন। তিনি ছিলেন ভীষণ দৃঢ়চেতা পুরুষ। একবার তিনি যা ভাবতেন তা তিনি করতেনই।

প্রীতরামের কাজের ধারা বদলে গেল। এতদিন চাকরি করে যে অর্থ তিনি জমিয়েছেন, তা দিয়ে ব্যবসা করবেন বলে মন ঠিক করলেন। তাঁর ব্যবসা-বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ ছিল

লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রীতরামের এবারও দেরী হলো না। জয়টীকা কপালে পরেই যেন তিনি জন্মেছিলেন। অগাধ সম্পত্তির মালিক হলেন তিনি। বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বসতি। প্রীতরাম তাঁর শূন্যঘরে লক্ষ্মীকে সোনার খাঁচায় পুড়ে ফেললেন। তাঁর অসাধারণ উন্নতি এবং উদ্যম দেখে মান্না পরিবারের যুগোলকিশোর নিজের মেয়েকে প্রীতরামের হাতে অর্পণ করলেন। বিয়েতে জামাইকে যৌতুক স্বরূপ দিলেন যোলো বিঘে জমি।

পীতরামের তখন স্বচ্ছল অবস্থা, প্রচুর সম্পদের অধিকারী তিনি। খ্যাতি, টাকাকড়ি, জমিদারি সব দিক দিয়েই উন্নতির শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছেন তিনি। একদিন এই মানুষটি নিঃস্ব অবস্থায় জীবন সুরু করেছিলেন। তখন অর্থ-বল, জন-বল তাঁর কিছুই ছিল না।

বেলেঘাটায় দুটো বড় আড়ৎ ছিল। একটায় বাঁশের কারবার ছিল। অন্যটায় বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রী হতো। এইসব জিনিসপত্র জোগাড় করা হতো মাকিমপুর পরগণা থেকে। এই মাকিমপুর তালুক তিনি উনিশ হাজার টাকায় পরে কিনে নেন।

প্রীতরামের ভাগ্য সূর্য তখন মধ্যগগনে। জানবাজারের এই বাড়িটি তিনি নির্মাণ করলেন। দু'টি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলো তাঁর। বড় ছেলের নাম হরচন্দ্র আর ছোটো ছেলের নাম রাখলেন রাজচন্দ্র।

হরচন্দ্র অল্প বয়সে মারা যান। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। ছোটো ছেলে রাজচন্দ্র হলেন পিতার নয়নের মণি। পুত্র শোকে তিনি খুব মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন।

ছ'লক্ষ টাকার ওপর সম্পত্তি রেখে প্রীতিরাম মারা গেলেন। পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী হলেন রাজচন্দ্র। সোনার চামচ মুখে করে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পিতা বর্তমান থাকতে প্রত্যক্ষভাবে কোনো দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েনি। এবার তিনি সম্পূর্ণ কাজের ভার তুলে নিলেন নিজের ওপর। কোনো ভাগিদার নেই। সব কিছুই তাঁর নিজের। জমিদারী দেখাশুনা, সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ সব কাজেই তিনি স্বয়ং হস্তক্ষেপ করলেন।

কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন ক্রমশই। অন্দরের বাইরেই তাঁকে থাকতে হয় বেশি। খুব ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর দিন কাটতে থাকে। স্ত্রী রাসমণি বোঝেন সব। তাই কাছে থাকতে না পারার জন্য কোনো অনুযোগ করেন না। তার স্বামী তো সাধারণ মানুষ নন। তাঁর অগাধ কাজ। স্বামীকে বরং তিনি আরো উৎসাহ দেন। পুরুষ মানুষ, পরিশ্রম তো করতেই হবে। যিনি আলস্যে দিন কাটান ভাগ্যলক্ষ্মী তার প্রতি কখনই সুপ্রসন্ন হন না।

পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন রাজচন্দ্র। তিনি তাঁর কাজের দায়িত্ব সুন্দর ভাবেই পালন করতে লাগলেন। আর এই সব ব্যাপারে তাঁকে সর্বদা সাহায্য করেন তাঁরই সুযোগ্যা স্ত্রী রাসমণি।

পৈত্রিক অর্থ দিয়ে রাজচন্দ্র জাহাজী ব্যবসা সুরু করলেন। পিতার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা রয়েছেই, নতুন কিছু করতে না পারলে আনন্দ কোথায়! নিজের কর্মদক্ষতার পরিচয় চাইতো। নানা দ্রব্যপূর্ণ জাহাজ কিনে তা পুনরায় বেশি দামে বিক্রী করতে থাকেন। তসরের চাদর, মৃগনাভি, আফিং, নীল এইসব জিনিস তিনি বিলেতে রপ্তানী করতে সুরু করেন। ইংলণ্ডের কোলভিন কোম্পানী ছিল তাঁর এজেন্ট।

প্রচুর পয়সা আমদানি হতে থাকে। তাঁর এই নতুন ব্যবসা বেশ জমে ওঠে। এই কেনা-বেচার ব্যবসা তাঁর পিতা প্রীতরামও করেছেন। পিতার ব্যবসায়ী বুদ্ধি পুত্রের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। তিনিও বহু টাকা উপায় করলেন ব্যবসা করে।

রাজচন্দ্র শুধু একজন বড় ব্যবসাদার ছিলেন না, তিনি একটার পর একটা বড় কাজও করে গেছেন। সাধারণ লোকের উপকারে, সাধারণ লোকের জন্য অনেক টাকা তিনি জলের মতো খরচ করেছেন। যেমন ছিল তাঁর অঢেল পয়সা, তেমনি ছিল তাঁর উদার মনোভাব। বড় হতে গেলে বড় মন চাই। স্বামীর এই মহৎ কাজে রাসমণি সর্বক্ষণ তাঁর পাশে থেকেছেন।

॥ চার ॥

রাসমণির বাবা মারা গেলেন। সে বছর বাংলা দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রবল বন্যা দেখা দিয়েছিল। জলের সে কী উচ্ছ্বাস! সে কী তার স্রোত! জলের স্রোত বহু মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। মানুষের গবাদি পশু যে কত মরেছিল তার কোনো ইয়ত্তা ছিল না। বন্যাতো শুধু শস্য আর ঘর-বাড়ি নষ্ট করে না, সেই সঙ্গে আনে রোগ, অভাব, মৃত্যু আর মহামারি, কান্নার রোল পড়ে যায়। দুর্ভিক্ষও দেখা দেয়।

বন্যার কবলে পড়ে হাজার হাজার মানুষ অসহায় হয়ে যায়। সহায় সম্বলহীন মানুষগুলো দুঃখে ভেঙে পড়ে, কি করবে এখন? মাথা গুজবার স্থানটুকু পর্যন্ত নেই। মনোবল পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। মানুষের এই বিপদের দিনে চুপ করে থাকতে পারেন না রাসমণি আর তাঁর স্বামী। দু'জনে মিলে বন্যাপীড়িত মানুষদের সব রকম সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে রাসমণিও বড় হয়েছেন অনেক। তিনি এখন মেয়ে নন, জননী হয়েছেন। একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে।

অসংখ্য নরনারীকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করেছেন। টাকাকড়ি খাবার-দাবার এমন কি পরবার কাপড় পর্যন্ত এক একজনকে অকাতরে দান করেছেন। মাথা গোঁজবার আশ্রয় করে দিয়েছেন। সেই সব অসহায় মানুষগুলো রাণী আর রাজচন্দ্রের সুখ্যাতি করতে লাগল শতমুখে।

ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। মানুষের সেবা মানেই ভগবানের সেবা করা।

রাজচন্দ্রের দানের সীমা ছিল না। লোক-হিতকর অনেক কাজ তিনি করেছেন। তখনকার দিনে কলকাতায় গঙ্গার অনেক ঘাটই বাঁধানো ছিল না। স্নানার্থীদের কষ্টের অন্ত ছিল না। কাদায় সব সময় পিচ্ছিল থাকতো গঙ্গার ঘাট। অনেকে পড়ে যেত। খুব সজাগ থেকে সাবধানে পা ফেলতে হতো, একটু অন্যমনস্ক হলেই দুর্ঘটনা ঘটতো তাদের।

এজন্য রাজচন্দ্র কতগুলো কাঁচা ঘাট বাঁধিয়ে দিলেন, আহিরীটোলার গঙ্গায় সাধারণের স্নানের ঘাট, হাইকোর্টের কাছে বাবুঘাট, ইটালী, তালতলা, জানবাজার, বহুবাজার প্রভৃতি জায়গায় স্নানার্থী লোকদের জন্য ঘাট তৈরী সবই রাজচন্দ্রের সুকীর্তি।

মৃতপ্রায় ব্যক্তিদের জন্য তিনি একটি আশ্রয়স্থান নির্মাণ করেছেন। বাংলাদেশ তখন সংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মানুষ মারা যাবার আগেই তাকে দাহ করবার জন্য গঙ্গার ঘাটে আনা হতো। মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতো সকলে। গঙ্গার বুকে মৃত্যু হলে হিন্দুরা পরম পুণ্যের কাজ বলে মনে করতেন।

এই পুণ্যলাভের আশায় আত্মীয়স্বজন মুমূর্ষু ব্যক্তিটিকে গঙ্গার তীরে নিয়ে আসতেন। কোনো কোনো সময় তাঁদের এক আধদিন গঙ্গার ঘাটে থাকতে হতো। থাকার কোন সুব্যবস্থা ছিল না তখন। গঙ্গাযাত্রীদের খুব অসুবিধেয় পড়তে হতো।

পরোপকারী রাজচন্দ্র সাধারণের এই কষ্ট অনুভব করলেন।

এদিকেও দৃষ্টি পড়লো তাঁর। কেউ কেউ এসে তাঁকে অনুরোধও করে। তিনি নিমতলায় গঙ্গাযাত্রীদের নতুন আশ্রয়স্থান তৈরী করে দিলেন।

অনেক গ্রন্থাগারে বই কেনার জন্য অর্থ সাহায্যও করেছেন রাজচন্দ্র। শিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থাগারের একটা গুরুত্ব আছে। প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষাবিস্তারে হস্তক্ষেপ করতে না পারলেও গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে অর্থদান করেছেন। মেটকাফ্ হলের সরকারী গ্রন্থাগারে রাজচন্দ্র বই কেনার জন্য একবার দশ হাজার টাকা দান করেছিলেন।

তাঁর এই জনহিতকর কাজের মধ্যে বেলেঘাটার খালটিও ধরা যেতে পারে। বেলেঘাটার এই খাল খননের জন্য তাঁকে অনেকটা জমি ছেড়ে দিতে হয়। খুশী মনেই তিনি এই জমি সরকারকে দান করেন। একটা সর্ত ছিল। গরীব সাধারণ লোক বিনা করে খাল পারাপার হবে। একটি পয়সাও কর হিসাবে সরকার তাদের কাছ থেকে নিতে পারবে না।

তাঁর দেশপ্রীতি ছিল অসাধারণ। দেশের প্রতিটি মানুষকে তিনি আপন জ্ঞান করতেন।

একবার রামরতন বাবু এলেন রাজচন্দ্রের কাছে। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। রামরতনবাবু হুক ডেভিডসন এণ্ড কোম্পানীতে চাকরি করতেন। তখনকার দিনে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই কোম্পানীর খ্যাতি ছিল। একটা বিশেষ প্রয়োজনে কোম্পানীর কিছু টাকার খুব দরকার হয়ে পড়ে। রামরতন এসে রাজচন্দ্রকে ধরলেন কিছু টাকা তাঁদের কোম্পানীকে ধার দিতে হবে। খুব অসুবিধায় পড়েছে কোম্পানী।

এই বিদেশী কোম্পানীকে সাহায্য করার ইচ্ছে রাজচন্দ্রের ছিল না। অনেক টাকা ধার দিতে হবে। টাকার অঙ্কটা তো কম নয়। এক লক্ষ টাকা। রামরতন কিন্তু বন্ধুকে এসে ধরলেন। ঋণ তাকে দিতেই হবে। বার বার একজন বন্ধু এসে অনুরোধ করায় রাজচন্দ্র

ধার নিতে স্বীকৃত হলেন। তাঁর এই টাকা পেলে যদি কোম্পানীর বিপদ কাটে, তিনি দেবেন একলক্ষ টাকা।

কথা দেবার ক'দিন পরেই খবর বেরলো কোম্পানী দেউলে হয়েছে। রাজচন্দ্রও শুনলেন সে কথা। কিন্তু তিনি যে কথা দিয়েছিলেন বন্ধুকে, সেটাতো আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। ফেরত পাবার আশা না করে কথা মতো তিনি সাহেবের হাতে তুলে দিলেন এক লক্ষ টাকা।

গল্পের মতো শোনালেও রাজচন্দ্র যেমন ছিলেন দানশীল, তেমনি ছিলেন সত্যবাদী। লক্ষীর বরপুত্র এই মহাপুরুষটির গা বেয়ে অর্থ এসেছে। যখন তিনি যে কাজে হাত দিয়েছেন প্রচুর পরিমাণে তাতে তাঁর মুনাফা হয়েছে।

রাজচন্দ্র কি রকম ব্যবসাদক্ষ ও ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন, তার একটা পরিচয় দিচ্ছি। একদিন তিনি নিলামে পঁচিশ হাজার টাকার আফিং কেনেন। অনেকে নিষেধ করেছিল, এতে নাকি তাঁর ক্ষতি হবে। কারোর কথা শোনেন নি তিনি। পঁচিশ হাজার টাকার আফিং পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রি হলো সেই দিনই। একদিনেই তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ হয়। লোকে বলতো যেদিন বিশ হাজার টাকা লাভ না হত সেদিন খুব কম লাভ হতো বলে তিনি মনে করতেন। কোনো কোনোদিন তাঁর এই লাভের অঙ্ক লক্ষ টাকায়ও উঠেছে।

একবার ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক ধনী, অভিজাত সাহেব ভারতে বেড়াতে এলেন। সাহেবের নাম জেন বেব। বাংলাদেশে তিনি রাজচন্দ্রের অতিথি হলেন। তাঁর সমাদর আর যত্নে সাহেব খুব মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি কিছুদিন ভারতে ছিলেন। লণ্ডনে ফিরে গিয়ে বন্ধু রাজচন্দ্রকে তিনি একটি সোনার ঘড়ি পাঠান। সেটা ছিল তাঁর বন্ধুর প্রতি প্রীতি আর ভালবাসার স্মরণ চিহ্ন।

স্বামীর সৌজন্যে তখনকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সংগেই

পরিচয় হয়েছিল রাণী রাসমণির। প্রিন্স দ্বারকানাথ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ তখনকার কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক ছিলেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ছিলেন যেমন ধনী, তেমনি দানবীর। হিন্দু-কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে তিনি অনেক অর্থ দান করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক সৎ কাজে প্রচুর পয়সা তিনি ব্যয় করেছেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ সে সময় কলিকাতায় একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। আঠারো পর্বের বিরাট সংস্কৃত মহাভারত তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। দেশের মঙ্গল ও সমাজ-উন্নয়নের চিন্তাই তাঁর মন জুড়ে থাকত সব সময়। সে যুগে বিদেশী ভাবধারা আর খৃষ্টান ধর্মের প্রভাব থেকে সনাতন হিন্দুধর্ম ও তার কৃষ্টিকে বাঁচাবার চেষ্টা যাঁরা করেন রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁদেরই একজন।

এঁরা প্রত্যেকেই রাজচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

নতুন অট্টালিকা করে রামচন্দ্র সপরিবারে সবে সেই প্রাসাদে এসেছেন। তার কিছুদিন পরেই সেজ মেয়ে করুণাময়ী মারা যান। কন্যার এই মৃত্যুতে তিনি খুব ভেঙে পড়েন। কোন ছেলে ছিল না রাসমণি ও রাজচন্দ্রের। চারটি মেয়ে। পদ্মমণি, কুমারী, করুণাময়ী ও জগদম্বা। তিনটি মেয়েরই বিয়ে হয়েছিল।

রাসমণির বড় জামাই মানে পদ্মমণির স্বামীর নাম ছিল প্যারীমোহন চৌধুরী। সেজ মেয়ে করুণাময়ীর বিয়ে হয়েছিল মথুরনাথ বিশ্বাসের সঙ্গে।

বিয়ের অল্পদিন পরেই করুণাময়ী মারা যান। সেজ জামাই মথুরনাথকে রাসমণি খুব ভালবাসতেন। কোনো পুত্র না থাকায় সম্পূর্ণ পুত্রস্নেহটুকু পড়েছিল মথুরনাথের ওপর। রাসমণি তাঁর ছোট মেয়ে জগদম্বাকে মথুরনাথের হাতেই তুলে দেন।

জামাইয়ের মধ্যে মথুরনাথই রাসমণিকে সব কাজে, সব ব্যাপারে সাহায্য করতেন। তিনিই রাণীর ছেলের অভাব দূর করেন। তিনি শ্বশুর বাড়িতেই থাকতেন বেশি। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মথুরনাথ যেমন কর্তব্যশীল আর বুদ্ধিমান ছিলেন, তেমনি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা আর ধর্মের প্রতি গভীর ভক্তি ছিল। দক্ষিণেশ্বরে রাণীর মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে মথুরনাথের কর্তব্যবোধ আর ভক্তমনের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

রাণী ও রাজচন্দ্রের দু'জনেই দু'জনের পরামর্শে নিজের নিজের কাজ করে চলেছেন। এই সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো একদিন সন্ন্যাস রোগে রাজচন্দ্র মারা যান। অত্যন্ত দুঃখের দিন ঘনিয়ে এল রাণীর জীবনে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন রাজচন্দ্র বিদায় নিলেন এই পৃথিবী থেকে। তাঁর কর্মজীবনের যবনিকাপাত ঘটলো। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনপঞ্চাশ বছর।

রাজচন্দ্রের ওই নতুন বিরাট বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে আসে। রাজচন্দ্র প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীটের উল্টোদিকে এই প্রাসাদটি তৈরী করেন। সাতটি মহল আর তিনশ' ঘর ছিল এই বিরাট অট্টালিকায়। পরে এই বাড়িই 'রাণী রাসমণি' কুঠি নামে সুপরিচিত হয়।

॥ পাঁচ ॥

স্বামীর মৃত্যুতে রাসমণি ভীষণ মুষড়ে পড়েছিলেন। স্বামীই ছিল তাঁর একমাত্র সঙ্গী। একমাত্র বন্ধু। তাঁর সকল কাজের প্রেরণা। তাঁকে হঠাৎ হারিয়ে দু'চোখে অন্ধকার দেখলেন রাণী। তিনদিন পর্যন্ত মুখে জল ঠেকাননি। তিনি শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

কর্তব্যের ডাকে তাঁকে সাড়া দিতে হলো। এখন তো শুধু

শোক করার সময় নয় তাঁর। সামনে যে একটা বড় কাজ রয়েছে। স্ত্রী-জীবনের পরম বৃহৎ কর্তব্য। স্বামীর পারলৌকিক ক্রিয়া পরম পবিত্রভাবে সম্পন্ন করতে হবে। সেটা সুন্দর করে শেষ করাই তার প্রধান ধর্ম। রাণী চিরদিনই ভক্তিমতী ছিলেন।

তাঁর মহানুভব স্বামীর শেষ কাজ যাতে উপযুক্তভাবে পালিত হয়, তার সব আয়োজন করলেন রাণী রাসমণি। ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, কেউই অনিমন্ত্রিত রইলেন না তাঁর বাড়িতে। কেউ নিরাশ হয়ে ফিরলো না তাঁর বাড়ির দরজা থেকে। অনেক টাকা ব্যয়ে মহাসমারোহে শ্রদ্ধানুষ্ঠান শেষ হয়।

পূজাপাঠের জন্য এসেছেন খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল। স্বামীর পুণ্যার্জনের আশায় দু'হাতে দান করতে লাগলেন রাসমণি। দান গ্রহণ করতে এলেন অসংখ্য ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেরা দান গ্রহণ করে রাসমণিকে আশীর্বাদ করতে করতে ফিরে চললেন। অন্নহীন গরীব মানুষদের রাণী পেট ভরে খাওয়ালেন। তাদের হাতে দিলেন কাপড়, কম্বল, পশমী বস্ত্র। তারা তৃপ্ত হয়ে শতমুখে রাণীর যশ গাইতে গাইতে ফিরে চললো। রাণীর পতিভক্তির কথা ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে মানুষের মুখে মুখে।

অনুষ্ঠানের শেষের দিনে একজন সন্ন্যাসী রাণীর বাড়ির দরজায় এসে উদয় হলেন। তাঁর পরণে সামান্য এক কৌপীন। শিরে জটা। সারা দেহে ভস্ম মাখা। কিন্তু তাঁর মুখে অপূর্ব দিব্যকান্তি। চোখে ঝরে পড়েছে স্থির স্নিগ্ধ দৃষ্টি।

সন্ন্যাসীকে দেখেই চিনতে পারলেন রাসমণি। পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁকে বাড়ির ভেতর এনে বসালেন। স্বামী বেঁচে থাকতে এই সন্ন্যাসী হঠাৎ একদিন এসেছিলেন। সেদিন তিনি রাজচন্দ্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন একটি অতি মনোহর সর্বাঙ্গসুন্দর শ্রীরঘুনাথজীর মূর্তি। রাজচন্দ্র মাথা পেতে সন্ন্যাসীর এই দান গ্রহণ করেছিলেন। মূর্তিটিকে তিনি গৃহদেবতার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বহুদিন পরে সেই সন্ন্যাসী আবার এসেছেন তাঁদের বাড়িতে। রাসমণির আনন্দের আর সীমা থাকে না। এটা বুঝি ভগবানেরই আশীর্বাদ। এই দুঃখের দিনে রাণীর মনে একটা নতুন ভাবের সঞ্চার হয়। তিনি কিছু দান গ্রহণের জন্য সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করেন।

কিন্তু দান নিতে সন্ন্যাসী অনিচ্ছুক। তিনি তো গৃহী নন। কৌপীন সম্বল সাধু তিনি। দান সামগ্রীর কোনো প্রয়োজন নেই তাঁর। কি হবে ওসব দিয়ে। রাসমণির কোনো কথা শুনতে রাজী নয়। আজ এই পুণ্য দিনে তিনি তাঁকে শূন্য হাতে যেতে দেবেন না। কিছু দান তাঁকে গ্রহণ করতেই হবে। অগত্যা সাধু বলেন, তিনি একটা কম্বল আর একটা জলপাত্র নিতে পারেন। রাসমণি মহাহর্ষে তখনই কম্বল আর জলের পাত্র এনে রাখলেন সন্ন্যাসীর সামনে।

রাণীর কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে সন্ন্যাসী বললেন, তিনি একবার শ্রীরঘুনাথজীকে দেখে যাবেন। তিনিই একদিন এই মূর্তিটি এ বাড়িতে এনেছিলেন। রাণী তখুনি তাঁকে দেবালয়ে নিয়ে যান। দেবতা দর্শন করে আনন্দে সন্ন্যাসীর চোখে জলের ধারা নামে। তিনি রাসমণিকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেন।

সবচেয়ে আশ্চর্য রাসমণির জীবনে আর কখনও এই সন্ন্যাসীর দর্শন পাননি। তীর্থক্ষেত্রের কোথাও এই সাধুর দেখা মেলেনি। রাসমণি নিজের জীবনকে নতুন করে ঢেলে সাজালেন।

মৃত্যুকালে রাজচন্দ্র প্রায় আশীলক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে গেছেন। কে এই বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করবে। রাণী যেন কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁর পাশে রয়েছেন কেবল মেয়েরা। তখনকার দিনে মেয়েদের এত স্বাধীনতা ছিল না। অনেক বাড়িতে তাদের ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতিও ছিল না।

সকলের চোখে পড়লো রাণীর ব্রহ্মচারিণীর রূপ। রাসমণির একটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। জীবনে তিনি যখন যে অবস্থায় ছিলেন, তিনি নিজেকে সেই অবস্থায় সুন্দর করে মানিয়ে নিয়েছেন।

ছোটোবেলায় বাবা মা'র কাছে ছিলেন ভক্তিমতি, আদরিণী কন্যার মতো। ধনী শ্বশুর বাড়িতে নম্র. সেবাপরায়ণা, ধর্মশীলা বধূ হয়ে। ক্রমে বাড়ির কর্ত্রী হলেন। তারপর স্বামীর মৃত্যুর পর আবার নিজেকে বদলে ফেললেন।

অন্ধকার রাত থাকতে ঘুম থেকে উঠতেন। সকাল-সন্ধ্যায় দেবতার পূজো-অর্চনা স্বরু করেন। জপ-তপ, ধ্যান-জ্ঞানে তাঁর সকালটা কাটে। গলায় তুলসীর মালা শোভিতা রাসমণিকে দেখলে মনে হবে না যে তিনি গৃহী মানুষ। মনে হবে, তিনি সংসারের বাইরে। ভগবৎ চিন্তায় কিন্তু একেবারে ডুবে যাননি রাসমণি। তাঁর মনের প্রসার খুব বেশী। অপরিসীম ভক্তিমতী হলেও অনেক টাকার বিষয় সম্পত্তিকে তিনি অবহেলা করেন নি। বিষয় কার্য পরিচালনাতেও তিনি এমনই দক্ষতা দেখিয়েছিলেন যে কোথাও অর্থের অপব্যয় হয়নি। বুদ্ধির অভাবে কখনও সম্পত্তির হ্রাস ঘটেনি।

এই বিষয়ে তিনি জামাইদের সাহায্য নিতেন। তাঁদের সংগে পরামর্শ করতেন। তিনিও স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। কৃপণের মতো তিনি অর্থ জমিয়ে রাখেন নি। নানা সৎকাজে, তীর্থভ্রমণে, দেবতার অলংকার নির্মাণ, পূজাপার্বনে প্রচুর টাকা খরচ করেছেন রাসমণি।

আজকের মতো তখনকার দিনে কলকাতায় আমোদ-আহ্লাদের এত উপকরণ ছিল না। পুরনো আমলের কলকাতায় একটার পর একটা পূজো নিয়ে মেতে থাকতো উৎসব পাগল শিশু যুবা নরনারী। পূজোমণ্ডপে মানুষ এসে ভীড় করতো। আনন্দ গুঞ্জনে পূজো-প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠতো। দোল, রাস, দুর্গাপুজো, বাসন্তী পূজো, সরস্বতী পূজো ও কার্তিক পূজো প্রভৃতি পূজোর কি শেষ ছিল!

আজকাল অবশ্য অনেক পূজোই সার্বজনীন। সকলে মিলে চাঁদা তুলে একটা পূজোর আয়োজন করে। কিন্তু তখনকার দিনে এই রীতির প্রচলন একদম ছিল না। কোনো ধনীর গৃহে সারা

বছর নানা পূজোর আয়োজন হতো। বাড়ির পূজো হলেও তাতে কাতারে কাতারে নরনারী এসে যোগ দিতো। সকলেই সেই পূজোকে নিজের মনে করে আনন্দে মত্ত হয়ে উঠতো।

রাসমণির বাড়িতে দুর্গাপূজো, লক্ষ্মীপূজো, সরস্বতীপূজো, দোল প্রভৃতি সমস্ত বড় বড় পূজো অনুষ্ঠানই হতো।

একবার দুর্গাপূজায় এক সাহেবের সংগে বিবাদ বাঁধে রাসমণির। শরৎকাল। উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে চারদিকে। মহাষষ্ঠীর প্রভাতে ব্রাহ্মণের দল চলেছেন গঙ্গার দিকে। নব পত্রিকা স্নান করাবেন। তুমুল বাজনার শব্দে, জয়ধ্বনিতে, লোক-সমাবেশের কলরবে চারদিক মুখরিত। মাতৃপূজার আনন্দে পাগল হয়ে উঠেছে যেন সমস্ত দলটি।

প্রাতঃকালে এই দীপ্ত কলরবে ঘুম ভেঙে যায় এক সাহেবের। সকাল বেলার আরামের ঘুম, মেজাজ গরম হয়ে যায় তার। এই অসভ্য মানুষগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সে। বন্ধ করতে হবে অযথা এই হৈ-চৈ। ঘুমের অসুবিধে হয় এতে।

আমাদের দেশ তখন ইংরেজদের অধীনে। সাহেবরা বাঙালীদের হেয় চোখে দেখতো। সাহেবটি ব্যাপারটা ইংরেজ সরকারের কানে তুললো। বন্ধ করতে হবে এ ধরণের পূজাপার্বন। মূর্খ সাহেব রাসমণির ক্ষমতা আর মনোবল কল্পনা করতে পারে নি। রাণী কোনো শক্তিকেই পরোয়া করেন না।

পরাধীন দেশের নাগরিক হলেও সরকারের রাঙাচোখ তাঁর জন্য নয়।

এই পূজা আর উৎসবের মূলে যিনি ছিলেন, তিনিও কম অভিজাত নন। কলকাতার জানবাজারের সেরা ধনী জমিদার-গৃহিণী। সকলের কাছে তিনি রাণী নামে পরিচিত। ব্রাহ্মণের দলে এসে নালিশ করলেন রাণীর কাছে। সাহেবের মাথা গরম হয়ে ওঠার কথা শুনলেন রাসমণি।

বিধর্মীর এই আস্ফালনে রাণীর হয়তো আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তার কর্মচারীদের বললেন—পরের দিন আরো জোরে বাজনা বাজিয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে যেতে হবে সকলকে। আরো প্রবল কণ্ঠে মাতৃনাম নিয়ে পূর্ণ করে তুলতে হবে প্রভাত গগন।

ভয় ভাবনা তাদের মন থেকে মুছে গেল। রাণীর কর্মচারীরা পরম উৎসাহে প্রভাতের অপেক্ষায় রইলেন। পরের দিন তীব্র উৎসাহ আর উত্তেজনায় মা দুর্গার নাম করতে করতে, বাজনা বাজিয়ে তারা গঙ্গার ধার ধরে এগিয়ে চলেছেন।

সাহেব ভীষণ রেগে গিয়ে রাণীর বিরুদ্ধে শান্তিভঙ্গের মামলা উপস্থিত করলো। ইচ্ছে করে তার ঘুমের ব্যাঘাত করেছে। দেশের সরকার বিদেশী। সাহেবও বিদেশী। তাই সরকার পক্ষপাতিত্ব করলো বিচারে। একজনের অসুবিধেটাই বড় করে দেখলো তারা। একটি জাতির জাতীয় উৎসবকে তারা গুরুত্ব দিল না। বিচারে রাণীর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হলো। বিনা প্রতিবাদে রাণী সরকারের দপ্তরে জরিমানার টাকা দিলেন।

এত সহজে পরাজয় স্বীকার করতে রাণী প্রস্তুত নয়। এবার শুরু হলো তাঁর আর এক যুদ্ধ। বুদ্ধির লড়াই। জরিমানার টাকা জমা দিয়েছেন সত্যি কিন্তু সাহেবদের কাছে নতি স্বীকার করতে তিনি রাজী নন। জানবাজার থেকে গঙ্গাতীরে বাবুঘাট পর্যন্ত সমস্ত সদর রাস্তাটা গরাণ কাঠ দিয়ে মজবুত করে বন্ধ করে দিলেন। রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। অনেক টাকা খরচা হলেও সরকারকে জব্দ করতে রাণী পিছু হটলেন না।

সরকার-পক্ষ রাস্তা বন্ধে আপত্তি করলেন। রাণী বলে পাঠালেন—এ তাঁর নিজের সম্পত্তি। খাস জমিদারীভুক্ত। এ জমিতে তিনি যা খুশী তাই করতে পারেন। কেউ বাধা দিতে পারবে না। পরম সাহসের পরিচয় দিলেন তিনি।

সত্যি সত্যি সরকারের এবার কিছুই করার নেই, অথচ সর্ব-

সাধারণের ব্যবহারের একটা প্রয়োজনীয় রাস্তা, এটা বন্ধ থাকলে চলে কি করে? অনেক আলোচনার পর নিরুপায় হয়ে সরকার রাণীর জরিমানার সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দিয়ে দিলো। রাণীও তখন সকলের চলাচলের জন্য রাস্তা খুলে দিলেন।

কতখানি সাহস থাকলে একজন মহিলা হয়ে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে এভাবে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নামতে পারে! এ যে জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ।

কে এই অতুলনীয়া রাণী?

এই রাণী হচ্ছেন বাংলা দেশের প্রাতঃস্মরণীয়া, পুণ্যময়ী রাণী রাসমণি।

একবার তিনি মনস্থ করলেন রথ-যাত্রার উৎসব করবেন। সেটা ১২৪৫ সাল। জামাইদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন তিনি। জগন্নাথ-দেবকে রূপোর রথে বসিয়ে পথ পরিভ্রমণ করানো হবে। ধর্মপ্রাণা রাসমণির পূজো পার্বনে খুব আগ্রহ ছিল।

রাজচন্দ্র দাস জীবিত থাকা কালীন নিজের বাড়ীতে ধুমধামে প্রতিবছর দুর্গাপূজো হতো। রাসমণিও স্বামীর এই পুণ্য অনুষ্ঠানটি বজায় রেখেছিলেন। তিনি অতি সমারোহে প্রতিবছর মায়ের আরাধনা করতেন। শোনা যায় তখনকার দিনে এই পূজোয় রাণীর প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হতো। ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই নিমন্ত্রণ করতেন। রাণী প্রতি বছর হাসিমুখে মায়ের সেবায় কোষাগার থেকে ওই টাকা ব্যয় করতেন।

রথযাত্রার উৎসবকে কেন্দ্র করে রাণীর পরিবারে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। কাজের ব্যস্ততা দেখা গেল কর্মচারীদের মধ্যে। জগন্নাথদেবের জন্য রূপোর নতুন রথ চাই।

কে এই রথ তৈরী করে দেবে? সামান্য রথ তো হতে পারে না রাসমণির। আকারে যেমন বৃহৎ হবে, তেমনি কারুকার্য শোভিত ও সুন্দর হবে।

হ্যামিল্টন কোম্পানী তখনকার বিখ্যাত জহুরী। খুব নামডাক তার। দেশের গণ্যমান্য ধনীরা এই কোম্পানীতেই তাঁদের সৌখীন জিনিষপত্র তৈরী করান। রাসমণি প্রথমে ভেবেছিলেন এদেরই ওপর কাজের ভার দেবেন। ভালো কাজ করে। এদের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

কিন্তু শীঘ্রই তাঁর মত বদলে গেল। কেন তিনি বিদেশী কোম্পানীকে দিয়ে রথ গড়াবেন? দেশে কি ভালো কারিগর নেই?

ভালো জহুরীর খোঁজ করলেন তিনি। সন্ধানও মিললো ক'দিন বাদে। তারা পরমানন্দে এই রথ তৈরী করতে সম্মত হ্ল। দেশী কারীগরেরা এক মাসের উপর কঠোর পরিশ্রম করে রূপোর রথ তৈরী করে ফেললো।

রথ দেখতে এলেন রাণী। রথ দেখে তিনি অবাক! কী সুন্দর রথ তৈরী করেছে তার দেশের কাঞ্চন-শিল্পীরা, রথ দেখে খুব খুশী হলেন রাসমণি। মজুরী তো তারা পেলোই, ভালো কাজ করায় প্রত্যেকে পুরস্কার পেল সেজন্য।

শুভকাজের শুভদিন এগিয়ে এল। রথযাত্রার দিন জগন্নাথ দেবকে নিয়ে সেই রূপোর রথ প্রকাশ্য রাজপথে বেরোল। ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের রাণীর বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু হলো। রাস্তার দুধারে ক্রমশই লোক সমাগম হতে থাকে। কলিকাতার বড় বড় পথ ধরে রথ চলতে সুরু করলো। তিন তলা প্রকাণ্ড বড় রথ। রথের সামনে দুটো বলিষ্ঠ ঘোড়া রয়েছে। নিখুঁত তাদের দেহের আকৃতি। তারা যেন এক্ষুণি ছুটে বেরিয়ে যাবে। এমনি তাদের চঞ্চল ভঙ্গী, ঘোড়াদের পেছনে উঁচু কোচবাক্সে বসে রয়েছে কোচম্যান। ঘোড়া দুটির রশি তার হাতে।

মন্থর গতিতে রথটি এগিয়ে চলেছে। রাস্তার দু'পাশে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। রাণীর এই রূপোর রথ দেখার জন্য তারা ব্যাকুল। বাড়ির ছাদে, জানালায় বা দরজায় শুধু মানুষের

মাথা। তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রথের দিকে। এমন সুন্দর রথ তারা আগে আর দেখেনি কখনও।

ওপরের প্রকোষ্ঠে বসে আছেন রথের অধিপতি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। সমস্ত রথ ফুলে ফুলে ঢাকা। তাছাড়া রয়েছে আরো নানা আড়ম্বর উপকরণ। রথের সামনে ও পেছনে বাজনা বাজিয়ে চলেছে বাদকের দল। সহস্র কণ্ঠে রাণীর জয়ধ্বনি হতে থাকে। রাণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে দেশের জনগণ। এই বিপুল অর্থ ব্যয় হওয়ার জন্য তিনি দুঃখিত হন নি একটুও।

শুধু দেবপূজা আর উৎসব অনুষ্ঠানে রাণীর মন তৃপ্ত হয়নি। তীর্থ ভ্রমণেও তাঁর অসম্ভব ঝোঁক ছিল। স্বামীর সংগেও কয়েকবার দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ভারত তীর্থময়। পবিত্র এই ভারত ভূমির পথে-প্রাঙ্গনে, বনে-উপবনে কত মন্দির, কত দেবদেউল ছড়িয়ে আছে।

অদেখা দেবতার টানে, পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় আশ্রম থেকে সন্ন্যাসীর দল বেরিয়ে পড়েন পথে। তীর্থের আকর্ষণও কম নেই তাঁদের। বন্দীজীবন তাঁদের কাম্য নয়। পরম পাওয়ার পবিত্র সংকল্প নিয়ে ছাড়ে গৃহবাসী মানুষ।

বন্ধুর পথ তাঁরা একটু একটু করে অতিক্রম করে। পথে কত বিপদ, কত রকমের কষ্ট, তীর্থের আকর্ষণে ধর্মপ্রাণ মানুষ সেগুলো উতরে এগিয়ে যায়। শত বাধা বিপত্তি তাঁদের পথ রোধ করতে পারে না। দুর্জয় সাহস তাদের মনে এসে বাসা বাঁধে।

তারপর একদিন সেই মানুষ যখন দেবতার সামনে এসে পৌঁছয়, প্রত্যক্ষ অনুভব করে দেবতার স্পর্শ, তখন পথের শত বাধা, শত কষ্ট মুহূর্তে মন থেকে মুছে যায়। ভক্তি আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। আনন্দাশ্রু চোখ থেকে নেমে আসে।

পরম পবিত্র লগ্নে ভক্তি আর ভগবান একাত্ম হয়ে মিলে যায় এক সূত্রে।

॥ ছয় ॥

তীর্থভ্রমণে বেরোবার পূর্বে রাসমণি ভাবলেন, একবার জন্মভূমি থেকে ঘুরে আসবেন। বহুদিন যাওয়া হয় নাই। সুযোগের অভাব ও কাজের ব্যস্ততায় গ্রামে যেতে পারেননি।

কথায় বলে জননী জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়। রাসমণি কথাটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি আর অপার ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকলেও, জন্মভূমির কথা তাঁর মন থেকে মুছে যায়নি। অবুঝ মনের সবুজ শোভা তিনি ভুলতে পারেননি। মাঝে মাঝেই তাঁর মনে পড়তো খেলা-ধুলা আর আনন্দ-ঘেরা ছোটো কোনা গ্রামটির কথা।

কোনা গ্রামের পাশে ত্রিবেণীতে তিনি কতবার স্নান করতে গেছেন। কিন্তু ফেরার তাড়া থাকায় গ্রামে নামা হয়নি। জল-পথে নৌকা করে গেছেন তিনি। ত্রিবেণী পবিত্র হিন্দু তীর্থ। ত্রিবেণী দুটো। একটা উত্তর প্রদেশে, আর একটা বাংলা দেশে। উত্তরাপথের ত্রিবেণীতে গঙ্গা হয়েছেন যুক্ত-বেণী। বাংলা দেশের ত্রিবেণীতে তিনি হয়েছেন মুক্ত-বেণী।

ত্রিবেণীতে স্নান করতে চললেন রাসমণি। এবার ঠিক করলেন, স্নানের শেষে জন্মভূমি দেখে ফিরবেন। সঙ্গে তাঁর ছোট জামাই মথুরনাথ রয়েছেন।

পিতৃ-পিতামহের ভিটের খবর তিনি রাখতেন। ভিটেতে এখন আর কুঁড়ে ঘরও নেই। কেউই থাকে না সেখানে। রাসমণি কেবল বছর বছর খাজনা দিয়ে জমির অধিকারটুকু বজায় রেখেছেন।

গ্রামে গেলে ক'দিন তো থাকতে হবে। অন্ততঃ তিনটি রাত

তাঁকে থাকতে হবে জন্মভূমিতে। তাই আগে থেকেই টাকাকড়ি দিয়ে রাসমণি কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। কয়েকটা ঘর তারা এই ক'দিনে তৈরী করে রাখবে।

গ্রামে সাড়া পড়ে গেল। রাণী আসছে তাদের গ্রামে। বাংলার বিখ্যাত মহিলা সে। কোনার গর্ব। যারা রাসমণিকে দেখেনি, তারা দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। যারা তখন কিশোরী রাণীকে দেখেছেন, তারাও নতুন করে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেন। দু'দশ ক্রোশ দূরের গ্রামেও এ খবর গিয়ে পৌঁছায়।

বহুদিন বাদে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরে রাসমণি তাঁর জন্মভূমিতে এসে পা দিলেন। কৈশোরের পুরনো দিনের কত স্মৃতি এসে মনের মধ্যে ভিড় করে। তরুলতা, স্মৃতিকণা, পদ্মাবতী কে কোথায় আছে কে জানে। হয়তো কোন্ দূরদেশে তাদের বিয়ে হয়েছে। পরম সুখে স্বামীর ঘর করছে। পুত্র-কন্যায় ঘর ভরে গেছে। অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া বাল্যকালকে যেন খুঁজে পেলেন আবার। আনন্দে তাঁর মন আলোড়িত হতে থাকে। বাবা মা'র স্নেহ-ভালবাসা, প্রিয় সঙ্গীদের হাস্য-কৌতুক একে একে সবই মনে পড়তে থাকে।

রাসমণির আঙিনায় জনতার ভিড় বাড়তে লাগল ক্রমশ। কোনার নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব সকলেই তাঁকে দেখতে এসেছে। কোনা ছাড়িয়ে দু'দশ ক্রোশ দূরের লোকও এসেছে রাসমণিকে দেখতে। রাসমণির খ্যাতি তখন বাংলার চতুর্দিকে ছড়িয়ে। রাণী সকলের সঙ্গে সমানভাবে আলাপ-পরিচয় করলেন।

সঙ্গীদের খোঁজ করতে তাঁর ভুল হলো না। তরুলতা পাশের গ্রামেই ছিল। রাসমণি লোক পাঠিয়ে বাল্য-সহচরীকে ডেকে পাঠালেন। পরে রাণীর অভ্যর্থনায় দু'জনের পুরনো বন্ধুত্ব জমে উঠলো আবার। তরুলতার এখন তিন ছেলে, তিন মেয়ে। রাণী প্রত্যেকের জন্য নতুন জামা কাপড় কিনে আনলেন। মেয়েদের দিলেন রঙিন শাড়ী। বন্ধুদের দিলেন একখানা করে বেনারসী।

স্মৃতিকণা তখন গ্রামেই ছিল। তাঁর মা বেঁচে আছেন শুনে পাটের কাপড়, মিষ্টি নিয়ে রাসমণি চললেন বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করতে। বৃদ্ধা তো অবাক! ধনীর গৃহিণী রাসমণি এসেছেন তাঁরই কুঁড়ে ঘরে। এত নাম ডাক যাঁর, একটুও অহঙ্কার নেই তাঁর মনে।

পদ্মাবতী অসুস্থ থাকায় সে দেখা করতে আসতে পারেনি। তার বাড়িতেও রাসমণি গিয়েছিলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। রাণীর নম্র-মধুর ব্যবহারে গ্রামের সকলেই মুগ্ধ হয়ে যায়। অবস্থায় তারতম্য ঘটলেও মনের পরিবর্তন হয় নি একটুও।

তিন রাত্তির জন্মভূমিতে কাটালেন রাসমণি।

বিদায়ের লগ্ন এগিয়ে এল। হাতে তাঁর এখন অনেক কাজ। বিদায়ের আগে গ্রামবাসীরা একত্রে এক অনুরোধ করে বসলো। সকলের স্নানের জন্য গঙ্গায় একটা ঘাট করে দিতে হবে তাঁকে। রাণী আনন্দের সঙ্গেই প্রস্তাবে রাজী হলেন। এর জন্য তিনি ত্রিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করলেন।

ফেরার পথে রাসমণি কোনা থেকে বংশবাটিতে গেলেন। বদ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে হিন্দুদের এক পবিত্র মন্দির আছে। হংসেশ্বরী মন্দির। দেখতে এলেন এখানে। প্রতি তীর্থক্ষেত্রে এসে রাসমণি দু'হাতে দীন-দরিদ্র ও ব্রাহ্মণদের দান করেছেন। এখানে এসেও তার কোনো ব্যতিক্রমে হলো না। এখানকার দানশীল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন রাজা নৃসিংহদেব। তাঁর স্ত্রীর নাম শঙ্করী। তিনিও কম দয়াবতী নন।

ধনী হলেও তাঁরা রাসমণির মতো অত বিত্তশালী নন। রাসমণি শঙ্করীকে বললেন, বংশবাটির ব্রাহ্মণদের তিনি কিছু দান করতে চান। এতে শঙ্করী খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তিনিও ছিলেন দানশীলা মহিলা। তিনি বললেন, রাসমণি যদি ব্রাহ্মণদের অর্থাদি দান করে যান, তাহলে তাঁর দানের আর স্থান থাকবে না। তার দানের আর নাম হবে না।

রাসমণি শঙ্করীর ব্যথা বুঝলেন। শুধু নামের জন্য তো তিনি দান করতেন না। যশ, খ্যাতি তাঁর কম নয়। দানের আনন্দে তিনি দান করে থাকেন। তিনি নিজের দানের প্রস্তাব তুলে নিলেন। কলকাতায় ফিরে এলেন তিনি।

সেটা ছিল ১২৫৭ সাল। রাসমণি মনস্থ করলেন, আবার তিনি তীর্থ-ভ্রমণে বেরোবেন। নায়েব ও তু' জামাইয়ের ওপর কার্যভার চাপিয়ে মুক্ত হলেন তিনি। ছোটো জামাই মথুর তাঁর সঙ্গে যাবে। পুরী যাবেন এখন। জগন্নাথদেবকে দর্শন করবেন তিনি। সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

যাত্রার শুভ মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। তখন তীর্থ ভ্রমণ আজকের মতো এত সহজ ছিল না। জলপথে নৌকায় যেতে হতো সর্বত্র। পথে অনেক অসুবিধায় পড়তে হতো প্রায়ই। দস্যু তস্করের উপদ্রবও ছিল। প্রাকৃতিক তুর্যোগ তো ছিলই। জল-ঝড়, জীব-জন্তুর ভয় তো ছিলই।

মেয়েদের গলার স্বর ভারী হয়ে এল। চোখের পাতা জলে ভিজে গেল। কতদিন পর তারা আবার মাকে দেখতে পাবে। দাসদাসী, আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেই গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত এল রাণীকে বিদায় দিতে। সে এক শোভাযাত্রার মতই দেখাচ্ছিল।

পাঁচখানা বড় বড় নৌকো গঙ্গার বুকে চলতে সুরু করলো। লোকজন অনেক সঙ্গে নিয়েছিলেন তিনি। লাঠিয়ালদের একটি দলও তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। গঙ্গা উত্তীর্ণ হয়ে ক্রমে নৌকোগুলো নদীর মোহনায় এসে পড়লো। গঙ্গানদী এখানে সাগরের বুকে এসে মিলেছে। সার বেঁধে নৌকোগুলো এগিয়ে চলছিল।

পথে জল-ঝড়, অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে তাঁদেরকে। শত কষ্ট আর অসুবিধে সহ্য করেও রাণী তাঁর সঙ্গীদল নিয়ে শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে এসে পৌঁছলেন।

তৃষ্ণার্ত প্রাণ যেন সুধারসের স্বাদ পেল এতদিনে। নীলাচলের আরাধ্য দেবতাকে দর্শন করে পরম তৃপ্তিলাভ করলেন রাসমণি। অনেকদিনের সাধ পূর্ণ হলো যেন এতদিনে। পরম ভক্তি আর আনন্দে তিনি প্রদক্ষিণ করলেন দেবমন্দির। দর্শন করলেন জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মূর্তি।

শুধু দর্শনেই রাণীর মন তৃপ্ত নয়। হীরের মুকুট দিয়ে সাজিয়ে দেবেন এই তিন বিগ্রহকে। রাণীর ইচ্ছা মতই কাজ হলো। প্রায় ষাট হাজার টাকা খরচ হলো তাঁর। তিনটি হীরক-খচিত মুকুট তিনি দান করলেন।

পুরী থেকে জলপথে দেশে ফিরে এলেন রাসমণি। পথের অসুবিধের কথা কিন্তু তিনি ভুললেন না। সুবর্ণরেখা থেকে জগন্নাথক্ষেত্র পর্যন্ত একটি প্রশস্ত পথ তিনি নির্মাণ করে দিলেন। এতে অনেক টাকা খরচ হয় তাঁর। টাকার মায়া রাসমণির ছিল না। পথের অব্যবস্থার ফলে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে তাঁকে এক এক জায়গায় খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তীর্থযাত্রীদের অনেক দিনের স্থায়ী একটা অসুবিধে চিরদিনের মত দূর হয়ে গেল।

আগেকার দিনে তীর্থভ্রমণে মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল খুব। জলে কিংবা ডাঙায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে চোর ডাকাতের দল। অসহায় পথিক বা তীর্থযাত্রীকে প্রাণে মেরে তার সব কিছু লুঠ করে নিয়েই এরা দিন চালায়।

রাসমণিও একবার এই ডাকাতদের মুখোমুখি পড়েছিলেন। নবদ্বীপ থেকে ফেরার পথে চন্দননগরের কাছাকাছি এক জঙ্গলের কাছে তিনি আক্রান্ত হন। তখনকার দিনে স্থলপথে পাকা রাস্তার অভাব ছিল। তীর্থাদি ভ্রমণ করতে হলে জলপথেই বেরোতে হতো। রাণী নৌকা করে জলপথেই কলকাতায় ফিরছিলেন। নদীর ধারেই ছিল একটা বড় জঙ্গল।

এই জঙ্গলের মধ্যে একদল দস্যু ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল।

রাণীর নৌকো তাদের কাছাছাছি আসতেই হৈ হৈ করে তারা নৌকো আক্রমণ করলো। রাসমণির ভীষণ মনবল ও দুর্জয় সাহস ছিল। দস্যুদের দেখে তিনি একটুও ভয় পেলেন না।

রাণী অবশ্য অরক্ষিতা ছিলেন না। তাঁর সঙ্গেও দেহ-রক্ষী, পরিচারক, দারোয়ান সবই ছিল। লাঠি চালাতে এরা কম পটু ছিল না। দস্যুরা সংখ্যায় সেদিন বারোজন ছিল। লাঠি বাগিয়ে তারা ছুটে আসে। হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে পড়ায় রাণীর রক্ষীদল একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল। রাণী তাদের সাহস দেন। দাঁড়িয়ে মার খেতে তারাও রাজী ছিল না। তাদের রাণীমা'র গায়ে আঘাত লাগলে তারা মুখ দেখাতে পারবে না কাউকে। তারাও এবার সকলে লাঠি বাগিয়ে ধরলো। দুপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বেধে গেল। নীরব প্রান্তর লাঠির ঠক্‌ঠক্ শব্দে মুখরিত হয়ে উঠলো। কোনো পক্ষই সহজে হারতে রাজী নয়।

একদল তাদের আত্মসম্মান, মান-মর্যাদা, ধন-দৌলত বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। প্রাণ দেবে তবু মান দেবে না। জীবন থাকতে রাণীমা'র কোন ক্ষতি হতে দেবে না। ধন-দৌলত লুঠ করবার লোভে অপর দল মরিয়া হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ মারামারি চললো। অবশেষে দস্যুদলের কয়েকজন আহত হলে। জলের মধ্যে মাথা ঘুরে পড়ে গেল একজন। দস্যুদের দলপতি ব্যাপারটা আবার মিটমিট করে নিতে চাইল। কোনো আক্রোশের বশবর্তী হয়ে তারা মারামারি করতে আসেনি। মারামারি করা তাদের উদ্দেশ্য নয়! ধন-দৌলত, টাকাকড়ির দিকেই তাঁদের ঝোঁক। ওসব পেলেই তারা চলে যাবে।

রাণী শুনলেন দলপতির কথা। অর্থের অভাব তাঁর নেই। তিনি দলপতিকে বললেন, টাকাকড়ি নেওয়াই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমার কাছে যা আছে তা তোমরা নিতে পারো। আমার কাছে এখন সামান্য টাকা আছে। এ নিয়ে খুশী হলে নিতে পারো, আমার কোনো আপত্তি নেই।

রাসমণির এ কথার উত্তরে দলপতি কোন কথা বলতে পারে না। যুদ্ধে তাদের হার হয়েছে। জোর করার কিছু নেই। রাণীর ব্যক্তিত্ব আর তাঁর দেবীসুলভ চেহারায় সে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তাকে নীরব দেখে রাসমণি আবার বলেন, যদি এই সামান্য অর্থে তোমরা সন্তুষ্ট না হও, তাহলে আমাকে বিশ্বাস কর, কাল ঠিক এই সময় তোমাদের বারোজনের জন্য আমি বারো হাজার টাকা পাঠিয়ে দেব। আমারই দারোয়ান তোমাদের হাতে টাকার থলিটা দিয়ে যাবে।

রাণীর কথা বিশ্বাস করে দস্যুরা চলে গেল সেদিনকার মতো। রাণীও ফিরলেন তাঁর কলকাতার বাড়িতে। তাঁর দলের জন দুই একটু জখম হয়েছিল। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। দস্যুদের কথা দেওয়া আছে। পরের দিন থলে ভরে বারো হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

গল্পের মতো শুনলেও এ ঘটনা সত্য। কথার দাম রাখতে তাঁর স্বামী রাজচন্দ্র দাস দেউলে ব্যবসায়ীর হাতে একলক্ষ টাকা তুলে দিয়েছিলেন। কারণ সাহেবকে টাকা দেবেন কথা দিয়েছিলেন তিনি। রাণীও তাঁর সত্য রক্ষা করলেন।

॥ সাত ॥

দ্বিতীয়বার যখন রাসমণি নবদ্বীপে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি সেখানে সাধু-সজ্জন, বৈষ্ণব ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের অকাতরে দান করেছিলেন। সেই দানের অর্থের অঙ্ক দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। নানাস্থানে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে রাণী চার বছরে প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা দান করেছিলেন। তিনি যেখানেই গেছেন মুক্তহস্তে দান করেছেন।

দানে রাসমণির কোনো তুলনা হয় না। কয়েক শতকের মধ্যে বাংলা দেশে এতবড় দাতার আর আবির্ভাব হয়নি। ধনী ব্যক্তি বাংলা দেশে আজও আছে, কিন্তু মহৎ মনের অভাব ঘটেছে খুব। আজকের ধনীরা খুব স্বার্থ-সন্ধানী ও অর্থলোভী হয়ে পড়েছেন। দানের কথা তাঁরা কল্পনা করতেও পারেন না, সাহায্য করা তো দূরের কথা তাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে দেশের সাধারণ মানুষদের শোষণ করছেন।

পরবর্তীকালে রাসমণি নিজে প্রজাদের সুবিধের জন্য একটি খাল খনন করান। একলক্ষ টাকার মতো তাঁর খরচ হয়েছিল এই খাল খনন করতে। মধুমতী নদীর সঙ্গে নবগঙ্গাকে মিলিয়ে দিয়েছে এই খাল। 'টোনার খাল' নামে এই খালটি পরিচিত। তিনি উদ্যোগী হয়ে সোনাই, বেলেঘাটা, ভবানীপুরে বাজার বসালেন। কালীঘাটে স্নানের ঘাটও তিনি নির্মাণ করেন।

একজন মাত্র মহিলা। কিন্তু দিকে দিকে তাঁর কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত। দেবতা ও ব্রাহ্মণদের প্রতি তিনি ছিলেন গভীর ভক্তি-পরায়ণা। গরীব, দুস্থ মানুষদের নিকট তিনি মায়ের মতো স্নেহশীলা।

শুধু কোমল স্বভাবা, দয়াবতী মহিলাই ছিলে না তিনি, শত গুণে গুণান্বিতা ছিলেন তিনি। রাণী রাসমণির মধ্যে দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী গুণের ধারা এসে মিলেছে। কোমলতা ও কঠোরতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা গেছে তাঁর মধ্যে। যেমন ছিল তাঁর আত্মসম্মান বোধ, তেমনি ছিল তাঁর মনের তেজস্বীতা। সহজ সরল আচরণের মধ্যে অদ্ভুত দৃঢ় সম্ভ্রমবোধ ছিল তাঁর। যেমন ছিল রাসমণির প্রখর বুদ্ধি, তেমনি ছিল তীক্ষ্ণ বিষয় নিপুণতা।

পরোপকারী, মহাপ্রাণা রাসমণি শরণাগতদের রক্ষা করতে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে কেউ কখনও বিমুখ হয়নি। অনেক কন্যাদায়গ্রস্থ পিতামাতাকে তিনি অর্থ সাহায্য করেছেন।

একবার একদল গরীব জেলেকে রাসমণি কি অপূর্বভাবে রক্ষা করেছিলেন; সে কথা গল্পের মনো আজও লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। তাঁর সাহসের জ্বলন্ত নিদর্শন রয়েছে এর মধ্যে।

গঙ্গায় মাছ ধরেই জেলেরা জীবন যাপন করে। এজন্য কোনো কালে কোনো রাজা বা জমিদারকেই কর বা শুল্ক দিতে হতো না। তাদের পিতা-পিতামহের আমল থেকেই এ ব্যবস্থা চলে আসছে। বংশ পরম্পরায় এই গঙ্গায় জেলেরা মাছ ধরে থাকে।

বাংলাদেশ তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষরা ঠিক করলো গঙ্গায় যারা জাল ফেলবে, তাদের সকলকেই সরকারকে কর দিতে হবে। বিনা করে গঙ্গায় আর মাছ ধরা চলবে না। এর নাম জলকর। সরকারেরর আয় বাড়বে তাতে।

বিনা মেঘে বজ্রাপাত। গরীব জেলেরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। তাদের এতদিনকার অধিকার। বিনা কর-এ মাছ ধরে এসেছে এতদিন। মাছ ধরে তাদের সামান্য আয় হয়। সেই আয় থেকে সরকারের কর দিতে হলে তারা খাবে কি? মাছ ধরাই তাদের শেষ পর্যন্ত হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। ভাবী অভাবের কালো ছায়ায় তারা চঞ্চল হয়ে উঠলো।

জেলেরা সকলে মিলে সরকারী দপ্তরে এসে ভিড় করলো। কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক আবেদন-নিবেদনও করলো তারা। এই কর তুলে নেওয়া হোক। শক্তিমান বিদেশী সরকার গরীব জেলেদের কাতর অনুরোধে কর্ণপাত করলো না। দুর্বলের প্রার্থনায় তারা কেন সাড়া দেবে?

জেলেদের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। অগত্যা তারা এল রাণী রাসমণির কাছে। তাঁর কাছে তারা নিবেদন করলো নিজেদের দুঃখ আর বিপদের কাহিনী। এই বিপদ থেকে একমাত্র রাণীমা'ই তাদের রক্ষা করতে পারেন! নতুবা তাদের বিপদ কাটবার নয়।

রাসমণি নীরবে শুনলেন সব কথা। বুঝলেন টাকার লোভেই

কোম্পানী এই অন্যায় করতে চলেছে। এই অর্থ-পিশাচ, লোভী বিদেশী সাহেবদের জব্দ করতে হবে। দেশের নিরীহ, অসহায় গরীব জেলেদের এই করের হাত থেকে বাঁচাতেই হবে। কর তারা দেবে না। বিনা বাধায় তারা অবাধে মাছ ধরে যাবে।

জেলেদের আশ্বাস দিয়ে বিদায় করলেন রাণী। তিনি এবার এ কাজে উদ্যোগী হলেন।

প্রথমে তিনি কোম্পানীর লোকদের চটাতে চাইলেন না। মাছের ব্যবসা করবে বলে ঘুসুড়ি থেকে মেটেবুরুজ পর্যন্ত গঙ্গার সমস্ত অংশটা কোম্পানীর কাছ থেকে জমা নিলেন কোম্পানী রাণীর এই অভিসন্ধি ধরতে পারলো না। কোম্পানীর হাতে দশ হাজার টাকা তুলে দিলেন তিনি।

কোম্পানী খুব খুশী রাণীর ওপর, একসঙ্গে অতগুলো টাকা তারা পেয়ে গেল। তাছাড়া টাকা আদায়ের জন্য কোনো হাঙ্গামা করতে হলো না।

জমা নেওয়ার পর বাঁশ আর দড়ি দিয়ে জমা বা ইজারা নেওয়া গঙ্গার ওই অংশটা বেশ মজবুত করে ঘিরে ফেললেন রাসমণি। গঙ্গার ওই অংশটা সম্পূর্ণ তাঁর আয়ত্তাধীন। পথ বন্ধ হয়ে গেল। ফলে ওই পথে নৌকা, জাহাজ চলাচল বন্ধ হলো।

কোম্পানী এই নতুন সমস্যার জন্য একদম প্রস্তুত ছিল না। খবর শুনে তারা তৎক্ষণাৎ ওই স্থান পরিদর্শনে এল। রাসমণির এই কাজের তীব্র প্রতিবাদ করলো। জলযানের পথ এরকম ভাবে আটক করা চলবে না। সাহেবদের এই ক্রোধে রাসমণি টললেন না একটুও। তিনি তেমনি স্বরে জবাব দিলেন, মাছের ব্যবসা করবেন বলেই অত টাকা দিয়ে তিনি জায়গাটা জমা নিয়েছেন। জাহাজ চলাচল করলে মাছের ক্ষতি হয়। জেলেদের কাজের অসুবিধে হয়। তাই সেইজন্য ওই অঞ্চলটা তিনি নিয়েছেন।

বেগতিক। বেড়া ভাঙবার কোনো অধিকার নেই। কোম্পানীর

সরকার তখন বুঝলো রাণীর আসল উদ্দেশ্য। নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য তারা রাণীর কাছে হেরে গেল। কোম্পানী জলকর আইন তুলে নিয়ে রাণীর সঙ্গে আপোস করলেন। জেলেরা মাছ ধরবে। খুশী হয়ে রাণীও গঙ্গার বুক থেকে বেড়া তুলে ফেললেন। আবার আগের মতই জাহাজাদি চলতে লাগলো। গরীব জেলেরা তাদের হারানো অধিকার ফিরে পেল রাণীর জন্য।

রাসমণির জয়জয়কার উঠলো চারিদিকে। একজন মেয়ে হয়ে সাহস আর বুদ্ধি দিয়ে তিনি বিদেশী সরকারকে হারিয়ে দিলেন। আরও অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছে রাণীর জীবনে। এইসব ঘটনার মধ্যদিয়েই তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিক প্রকাশ পেয়েছে।

কিছুদিন বেশ শান্তিতেই কাটে। নতুন গোলমালে আবার জড়িয়ে পড়লেন রাসমণি। অন্যায়ের কাছে তিনি কোনো অবস্থাতেই মাথা নত করতে রাজী নয়। অসির উত্তর অসির ঝংকারেই হওয়া ভালো, বিনয় সেখানে দুর্বলতার নামান্তর।

জগন্নাথপুরে রাসমণির খানিকটা জমি ছিল। তার কিছু প্রজাও ছিল সেই জমিতে। এই জমির পাশেই ব্রাহ্মণ জমিদার রামরতন রায়ের জমি ছিল। একে ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ, তার ওপর জমিদার। দাপট খুব। সম্পত্তিও কম ছিল না। যশোহর জেলার নড়াইলের পরাক্রান্ত জমিদার তিনি।

তখনকার দিনে শক্তিশালী জমিদারদের একটা বদ্-অভ্যাস ছিল। সুযোগ পেলেই পাশের জমিদারের জমি তারা গ্রাস করতেন। লুঠতরাজ তাদের লেগেই ছিল। ঘর বাড়িও পোড়ানো হতো। রামরতন রায়ের এই বদ্‌গুণগুলি ছিল।

রামরতন রায় হয়তো রাসমণিকে দুর্বল ভেবেছিলেন।

রামরতন রাসমণির সংগে হঠাৎ বিবাদ সুরু করলেন। রাসমণি স্ত্রীলোক। মুঠির জোর তাঁর নিশ্চয়ই কম। তিনি রাসমণির

জমিদারিতে নিত্য নতুন উৎপাত সুরু করলেন। নিত্য নতুন হামলা। কোনদিন প্রজাদের ওপর হঠাৎ নির্যাতন সুরু হয়। তাদের সম্পত্তি লুটপাট হয়ে যায়। কোনদিন বা তাদের ঘরে আগুন লাগানো হয়। প্রজারা হতাশ হয়ে পড়ে।

প্রজারা নিরুপায় হয়ে রাণীমার কাছে নালিশ করে। রোজ রোজ রাসমণির কানে এসে পৌঁছয় এই উপদ্রবের কথা। প্রজাদের তিনি পুত্রের মতো স্নেহ করেন। প্রজাদের ওপর তিনি কোনদিন অত্যাচার করেননি। রাসমণি এতে খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। খুব বিব্রত বোধ করেন। কাহাতক আর মুখ বুজে সহ্য করা যায় এই জঘন্য উৎপাত। নিশ্চয়ই কোনো বদ্ মতলব রয়েছে রামরতন রায়ের।

নড়াইলের এই জমিদার বেশ শক্তিশালী। নম্র কথায় কোনো কাজ হবে না। তাঁকে দুর্বল মনে করে তাঁর ওপর হামলা করছে। রাসমণি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। উপায় ভাবতে লাগলেন। কি করে শিক্ষা দেওয়া যায় এই জমিদারকে?

অবশেষে তিনি এক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন। ঠিক করলেন, শক্তি দিয়েই শক্তির পরীক্ষা নেবেন। লাঠি দিয়েই ঠেকাবেন লাঠির আঘাত। অকুতোভয়, নির্ভীক রাসমণি লড়বার জন্য প্রস্তুত হলেন। এক ইঞ্চি জমিও তিনি ভয়ে তাঁকে ছেড়ে দেবেন না।

মহাবীরের ডাক পড়লো। রাসমণির সিপাহী দলের সর্দার সে। লম্বা দোহারা গঠন। যেমন বলবান তেমনি খুব বিশ্বাসী। বেইমানি সে জানে না। বেইমানকে সে ছাড়বেও না। রাসমণি শীঘ্রই তাঁর পরিচালনায় বিরাট একটা সিপাহী আর লাঠিয়ালের দল পাঠালেন জগন্নাথপুরে। অস্ত্রশস্ত্র আর নানা যুদ্ধ-উপকরণে প্রস্তুত হয়ে গেল তারা।

মরবে নতুবা মারবে। দেহে প্রাণ থাকতে রাণীমার অসম্মান হতে দেবে না তারা। রাণীর এই অজেয় দল জগন্নাথপুরের মাটিতে তাঁবু খাটালো।

শুধু দল পাঠিয়ে কর্তব্য শেষ করলেন না তিনি, বলে পাঠালেন, জমিদারিতে অকারণ এরকম উৎপাত করা চলবে না। তিনি মহিলা হতে পারেন, কিন্তু কারোর ভয়ে ভীত নন। প্রয়োজনে তিনি খুব কঠোর ও নির্মম হতে পারেন। জমিদার রামরতন রাসমণির এ কথায় কর্ণপাত করলেন না। তার শক্তিও তো কম নেই।

রামরতন যদি একথা শুনতেন তাহলে গোলযোগ আর আগাতো না। এখানেই মিটে যেত। অন্যায়ভাবে কারোর জমি গ্রাস করবার ইচ্ছা ছিল না রাসমণির। তা বলে তাঁর জমি কেউ ভয় দেখিয়ে কেড়ে নেবে, তা তো হয় না। অন্যায়ভাবে যে কেউ তাঁর জমিদারিতে মাথা গলাবার চেষ্টা করবেন, তাকে তিনি উচিত সাজা দেবেন।

জগন্নাথপুর গ্রামে সাড়া পড়ে গেল। মহাবীরের পরিচালনায় কয়েকশো সিপাহীবাহিনী এসে জড়ো হলো। এত সৈন্য আর নানারকম অস্ত্রশস্ত্র দেখে জমিদার রামরতন রায় এবার ঘাবড়ে গেলেন। রাসমণির এক হাতে আছে বরাভয়, অন্য হাতে অসি। বুদ্ধিমান রামরতনবাবু শক্তি পরীক্ষায় আর এগোলেন না। শুধু শুধু উভয় পক্ষের কিছু লোকক্ষয় হবে।

রাসমণির সঙ্গে তিনি সন্ধি করলেন। দুই জমিদারের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হলো। সমানে সমানে বন্ধুত্ব জমে ভালো। অনেক দিনের সঞ্চিত ক্রোধ আর মনোমালিন্য দূর হয়ে গেল। পাশাপাশি এই দুই জমিদারের মিত্রতা বেশ গভীর হতে থাকে।

॥ আট ॥

সিপাহীদের মধ্যে তখন অসন্তোষের ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে। সিপাহীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দু'ধর্মেরই লোক ছিল। তখন বন্দুকের টোটা দাঁতে কেটে বন্দুকে ভরতে হতো। তারা শুনলো এই টোটায় গরু আর শূয়রের চর্বি মাখানো থাকে। গরু, শূয়রের চর্বি মাখানো টোটা দাঁতে কাটা হয়েছে জেনে সিপাহীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

সারা দেশের লোকের মনে কোম্পানীর ক্রিয়াকলাপে অসন্তোষ জমা হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল ইংলণ্ডের আর পাঁচটা কোম্পানীর মতই একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। বুদ্ধির জোরে ক্রমে ক্রমে এই কোম্পানী সামান্য অবস্থা থেকে ভারতের মতো বিরাট দেশের শাসক হয়ে ওঠে। ছলে-বলে-কৌশলে তারা রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে নেয়।

ধূর্ত এই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে, যে সব দেশীয় রাজাদের কোনো পুত্রসন্তান থাকবে না, সেই সব রাজাদের মৃত্যু হলে, তাদের রাজ্য কোম্পানীর অধিকারে আসবে। সাধারণ লোকের কোম্পানীর ওপর রাগ তো ছিলই; এই ব্যাপারে অপুত্রক দেশীয় রাজারাও রেগে গেলেন খুব। সিপাহীদের সাথে এইসব দেশীয় রাজারা যোগ দেন।

সিপাহীরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো কোম্পানীর বিরুদ্ধে। এমন একটা গোলযোগ বেঁধে গেল, যাতে দেশের লোক আর বিদেশী কোম্পানী উভয়ে উভয়ের পরম শত্রু হয়ে উঠলো। সিপাহীরা বাহাদুর শাহকে তাদের নেতা বলে মেনে নিল। উত্তাল তরঙ্গের মত এই আন্দোলন ফেঁপে উঠলো। বিদ্রোহ সবচেয়ে প্রবল হয়ে ওঠে দিল্লী, কানপুর প্রভৃতি জায়গায়। সারা উত্তর ভারতে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। সিপাহীদের সঙ্গে জায়গায় জায়গায়

সাধারণ লোকও যোগ দিয়েছিল। তারা সিপাহীদের সঙ্গে মিশে নির্বিচারে ইংরেজদিগকে হত্যা করতে লাগলো। ইংরেজরাও কঠিন হাতে এই বিদ্রোহ দমন করতে সচেষ্ট হয়।

সারা দেশ জুড়ে যখন এই অশান্তির দাবানল জ্বলছে, ইংরেজ আর ভারতীয়ের মধ্যে যখন শুধু ঘৃণা আর হিংসার সম্বন্ধ, তখন ফ্রী স্কুল ষ্ট্রিটে রাণীর বাড়ির সামনে একটা ঘটনা ঘটেছিল। লড়াই বেঁধেছিল কিছুক্ষণের জন্য। সেদিন রাণীর সাহস আর মনোবল দেখে বিদেশী সৈন্যরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীটে তখন একদল ইংরেজ সৈন্য বাস করতো। এই গোরা সৈন্যরা খুব উচ্ছৃংখল ছিল। এরা মদ খেত, হৈ হুল্লোড় করতো। প্রায়ই পথিকদের হাত থেকে জিনিষপত্র কেড়ে নিত। প্রতিবেশীদের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করে আনতো। ক্রমশই তাদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকে। অকারণে পাড়ার মধ্যে মারামারি গণ্ডগোল লাগিয়ে দিত. স্থানীয় নিরীহ অধিবাসীরা কোনো প্রতিকার করতে পারছিল না। কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করে তারা ব্যর্থ হলো। অগত্যা মুখ বুজে তাদের সহ্য করতে হচ্ছিল এই গোরা সৈন্যদের সকল রকমের দুর্ব্যবহার।

রাসমণির দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি বারবার এটা লক্ষ্য করছিলেন। বেয়াদপির মাত্রা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। তাঁর আর বরদাস্ত হচ্ছিল না এই অনাচার। এই গোরা সৈন্যগুলোকে একদিন সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে। ভারতীয়দের তারা কি মনে করে? তারা কি অসহায়? তারা কি দুর্বল?

সুযোগ খুঁজতে থাকেন রাসমণি। লক্ষ্য রাখেন এদের কার্য-কলাপের ওপর। সুযোগ একদিন এসে গেল। অন্যদিনের মতো সেদিনও গোরা সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়লো এক পথিকের ওপর। মদ খেয়ে মত্ত অবস্থায় সকলে মিলে পথিকের ওপর নির্যাতন শুরু করে।

লাঞ্ছিত, অপমানিত পথিকের মর্মবাণী যেন শুনতে পেলেন রাণী। এর কি প্রতিকার হবে না আর? হামলাটা সেদিন রাণীর বাড়ির সামনেই হচ্ছিল। রাণী তাঁর প্রাসাদ থেকে এই করুণ দৃশ্য দেখছিলেন। মথুরবাবুও বাড়িতেই ছিলেন। তিনি দারোয়ানদের হুকুম দিলেন, এই মুহূর্তে পথিকটিকে যেন ছাড়িয়ে আনে; আর অসভ্য সৈন্যদের উত্তম-মধ্যম দিয়ে এখান থেকে যেন তাড়িয়ে দেয়। এটা রাজবাড়ি, এর সম্ভ্রম রক্ষা করতে না পারলে শাস্তি পেতে হবে।

সিংহের মতো গর্জে দারোয়ানরা লাফিয়ে পড়লো। দু'দলে কিছুক্ষণ মারপিটও হলো। মাতাল সৈন্যগুলো পারবে কেন? মার খেয়ে গোরা সৈন্যরা নিজেদের তাঁবুতে ফিরে গেল। এদের মধ্যে কয়েকজন মাথায় আঘাত পেয়েছিল খুব।

গোলমালটা কিন্তু এখানে শেষ হলো না। সূত্রপাত হলো সবে। গোরা সৈন্যদের আক্রোশ গিয়ে পড়লো রাণীর ওপর। নিজেদের দোষ সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে সহকর্মীদের তারা ক্ষেপিয়ে তুললো রাণীর বিরুদ্ধে। রাণীর লোকজন তাদের শুধু শুধু মেরেছে। রাণীও তাদের সঙ্গে বিবাদ করতে শুরু করেছে। কোম্পানীর রাজত্ব হয়ে তাদের এই অপমান! এর প্রতিকার চাই। উচিত সাজা দিতে হবে রাণীকে; অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। সারা ছাউনী জুড়ে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে থাকে।

সারাদিন ধরে জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে সৈন্যদের মধ্যে। ক্রমে দিন যায় রাত আসে। রাত তখন দশটা। রাসমণির জামাইরা কেউই বাড়ি নেই। এমন সময় গোরা সৈন্যরা নানারকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়ি চড়াও করলো। একদল সৈন্য হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লো গেটের ওপর। সুসজ্জিত এই সৈন্যদের তুলনায় রাসমণির দারোয়ানরা আর ক'জন। তার ওপর তারা একদম প্রস্তুত ছিল না। একজন ছুটে গেল রাণীর সিপাহীদের খবর দিতে। বাকী ক'জন সৈন্যদের বাধা দিল। কিন্তু তারা পারবে কেন?

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের পিছু হটতে হলো। গোরা সৈন্যরা তাদের হারিয়ে বিকট উল্লাসে হৈ-হৈ করতে করতে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলো। ছড়িয়ে পড়লো তারা বাড়ির আনাচে কানাচে। বাড়ির মধ্যে ঢুকে তারা সুরু করলো অত্যাচার। লোকজনদের মারধোর করতে লাগলো। রাসমণির সাজানো সুন্দর বাড়ি নিমেষের মধ্যে তারা তছনছ করে ফেললো। অনেক পশুপাখী পুষতেন তিনি। আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললো সুন্দর হরিণগুলোকে। বুনো পশুর মত তারা হিংস্র হয়ে উঠেছে বাড়ির বড় বড় আয়না, আসবাবপত্র দারুণ শব্দে ভেঙে পড়তে লাগলো। ক্রমশই তারা মহলের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে?

কে তাদের বাধা দেবে? নিরীহ মানুষগুলো আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বিচলিত হয়ে পড়লেন রাসমণি। প্রাণভয়ে নয়, যদি গোরারা তাঁর রঘুনাথজীর মন্দিরে ঢুকে পড়ে কলুষিত করে গৃহদেবতাকে? আর তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না। তার সিপাহীদের আগমনের আশায় কতক্ষণ আর নীরব থাকবেন? ভেতর থেকে অন্দর মহলের দরজা বন্ধ করবার নির্দেশ দিয়ে তিনি ছুটে এলেন গৃহদেবতার মন্দিরে—তাঁর রঘুনাথজীর কাছে। হাতে তুলে নিলেন একখানা মুক্ত কৃপাণ। যদি কেউ রঘুনাথজীর মন্দিরে ঢুকতে আসে, তাকেই উচিত সাজা দেবেন। বীর দর্পে পরম নির্ভয়ে দেবতার দ্বার পাহারা দিলেন। জ্যোতির্ময়ী রাণী রাসমণির সেই মূর্তি ভুলবার নয়। তার দীর্ঘ লম্বা চুল খুলে পড়েছে পেছনে। সারা মুখে একটা থমথমে ভাব। ভয়ের লেশমাত্রও নেই কোথাও।

ভক্তের ভগবান। কোনো গোরা সৈন্যকেই রঘুনাথজীর মন্দির-মুখো হতো হলো না। মহাবীর তার সিপাহী নিয়ে এসে পরম বিক্রমে লাফিয়ে পড়লো গোরা সৈন্যের ওপর। বাড়ির প্রাঙ্গণে দুই দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বেঁধে গেল।

এই সময় ছোটো জামাই মথুরনাথও সৈন্যাধ্যক্ষকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। ইতিমধ্যে তার কানেও এই খবরটা গিয়ে পৌঁছেছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ি না এসে ছাউনির সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট ছুটে ছিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষকে দেখে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে পড়লো যার যার জায়গায়। জোঁকের মুখে যেন চুন পড়লো। মারমুখো সৈন্যরা লক্ষ্মী ছেলের মতো সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল রাসমণির বাড়ি থেকে।

গোলমাল অবশ্য মিটে গেল। কিন্তু রাসমণি এই ঘটনায় অত্যন্ত অপমান বোধ করলেন। তিনি খুব রেগে গিয়েছিলেন গোরাদের ওপর। সমাজের কাছে, প্রতিবেশীর কাছে তার যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে। তিনি আইনের আশ্রয় নিলেন। আদালতে নালিশ করলেন। গোরা সৈন্যরা তাঁর যা কিছু নষ্ট করেছে, তা সবই ফিরিয়ে দিতে হবে তাঁকে।

সত্যের জয় সুনিশ্চিত। সত্য তাঁর দিকে। জয় তাঁর হলো। মামলায় জিতলেন রাসমণি। আদালত নির্দেশ দিলো, সরকার তাঁর ক্ষতিপূরণ দেবে। সরকারের এই ক্ষতিপূরণ রাসমণি নিয়েছিলেন কি না তা ঠিক বলা যায় না। কারণ এ বিষয়ে দুটো মত রয়েছে। ক্ষতিপূরণ তিনি নিন বা না নিন সেটা বড় কথা নয়। তিনি যে নির্ভয়ে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন; সংগ্রাম করে নিজের মর্যাদা আদায় করেছিলেন এতেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন তখন সারা ভারতে ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলা তথা দক্ষিণ ভারতে এই অন্দোলন কম হলেও উত্তর ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহ দাবানলের মতো দাউ দাউ করে জ্বলছিল। এই অন্দোলনের সময় ভারতবাসীর মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

অদূর ভবিষ্যতে কারা এই ভারতবর্ষ শাসন করবে? কোন্ দল ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হবে?

সিপাহী পক্ষ না ইংরেজ পক্ষ? কোন্ দলকে মেনে নেবে দেশের লোক? ভীষণ এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল ভারতবাসী। এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু ঠিক করতে পারছিল না দেশের সাধারণ মানুষ।

দিল্লী, আগ্রা, মিরাট, লক্ষ্ণৌ কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সিপাহীদের সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এই সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের মধ্যে একটা আশা স্পষ্ট জেগেছিল, এই ভারতে সিপাহী-রাজ্য স্থাপিত হবে। কিন্তু বাংলা দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বুঝেছিলেন, যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি যাই হোক কোম্পানীই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবে। সিপাহীদের শক্তি ছিল বিচ্ছিন্ন। এই ভাবে দেশের ভবিষ্যৎ যাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন, রাণী রাসমণি তাঁদের মধ্যে একজন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাংলাদেশের লোক চেয়েছিল ইংরেজ কোম্পানীই জয়লাভ করুক। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে তখন তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। ইংরেজ রাজত্ব বজায় থাকলে শিক্ষায়, সভ্যতায় দেশ এগিয়ে যাবে অনেকটা। দেশের উন্নতি হবে। এই ইংরেজরাই সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের নতুন নতুন চিন্তা ধারার সংগে আমাদের দেশের শিক্ষিত মানুষদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

বহুলোক ভয়ে কোম্পানীর কাগজপত্র বিক্রি করে দিচ্ছিল, কারণ তারা ভেবেছিল কোম্পানীর শাসন বোধহয় আর থাকবে না। হাজার হাজার টাকার কোম্পানীর শেয়ারের কাগজ নামমাত্র মূল্যে বিক্রী হয়েছে। বুদ্ধিমতী রাসমণি কিন্তু নিজের কাগজ বিক্রি করেননি। বরং যারা কম দামে বিক্রয় করেছে, সেগুলো কিনে নিয়েছেন। পরে এই অল্প দামে কেনা শেয়ার পত্র থেকে তিনি

অনেক টাকা লাভ করেছেন। এতে রাসমণির দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সুযোগ-সুবিধা পেলেই সম্পত্তি বাড়িয়েছেন তিনি। স্বামীর সম্পত্তির যোগ্য পরিচালনা করেছেন তিনি।

রাসমণিকে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। সম্পত্তি বেশি হলে তার ঝুঁকি বেশি হয়। সব দিকেই তার দৃষ্টি ছিল। তার প্রজাদের ওপর অন্যায় অত্যাচার করে কেউ পার পায়নি। দেশী বা বিদেশী কাউকে তিনি ক্ষমা করেননি।

একবার এক বিদেশী বণিকের সাথে তাঁর বিবাদ বাধে। রাসমণির মাকিমপুর পরগণার জমিদারিতে উৎপাত আরম্ভ করেছিল এক নীলকর সাহেব। তার নাম ডোনাল্ড। নীলের চাষ করতো বলে সাহেবের আর একটি নাম হয়েছিল, সাধারণের মধ্যে। নীলকর সাহেব বলেই সে পরিচিত। এই নীলকর সাহেবেরা প্রায়ই ছিল ভয়ানক লোভী এবং কূট। নিজেদের স্বার্থ আর লোভের দিকটাই তারা সর্বদা বড় করে দেখতো। চাষীদের দুঃখ-কষ্টে তাদের মন একটুও বিচলিত হতো না। কর্ণপাতও তারা করতো না কারোর কথায়।

নীল আমাদের খুব প্রয়োজনীয় বস্তু। নানারকম জিনিস রং করার জন্য নীল খুব দরকার। এখন আমরা যে নীল দেখতে পাই তা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী হয়। আগে বৈজ্ঞানিক প্রথায় নীল তৈরী হতো না। তাই নীলের চাষ করা হতো। আর এই নীল চাষ করাতো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাহেবরাই। ভালো উর্বর জমি তারা বেছে নিতো এই চাষের জন্য।

আমাদের দেশের গরীব চাষীদের তারা আগে থাকতে মোটা টাকা দিয়ে হাত করে ফেলতো। অর্থের প্রলোভন এড়ানো সহজ নয়। যারাই নীলকর সাহেবদের এই টাকার জালে ধরা পড়তো, তাদের বাঁচবার আর কোনো পথ থাকতো না। টাকা ফেরত দেবার

ক্ষমতা তাদের কোনদিনই হবে না। তাদের জমিতে তখন নীল চাষ করতে হতো। ক্রমে ক্রমে নীলকর সাহেবেরা চাষীদের নীল বুনতে বাধ্য করাতো। তাদের আর ধান চাষ করতে দিতো না।

ধান না বুনলে চাষীরা সারা বৎসর খাবে কি? নীল চাষের লাভের টাকা তো সাহেবদের পকেটে যাবে। কিন্তু চাষীদের কোনো কথাই শুনতো না নীলকররা। দেনার দায়ে চাষীরাও মাথা তুলে প্রতিবাদ করতে পারতো না। চাষীরা সব সময় অনুগত না থাকলে কাছারিতে টেনে নিয়ে গিয়ে বেত পর্যন্ত মারতো।

প্রথম দিকে নীলকর সাহেবদের এই অন্যায় অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছিল চাষীরা। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বিপরীত ফলই হয়। চাষীরা ক্রমে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলো। দীনবন্ধু মিত্র লিখলেন তাঁর বিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণ'। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও একজন নীলকর সাহেবকে সাজা দিলেন। দেশের শিক্ষিত লোকের চোখে ধরা পড়লো নীলকরদের এই অন্যায়-জুলুম।

চাষীদের এই নিদারুণ দুঃখের কথা ক্রমে রাসমণির কানে এসে পৌঁছলো। রাসমণি কোনো কাজেই পিছু হটেন নি। তিনি ঠিক করলেন এর প্রতিকার করবেন। ডোনাল্ড সাহেবের দুর্ব্যবহার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁরই জমিদারীতে বসে তাঁর প্রজাদের চোখ রাঙাবে! তিনি একদল দক্ষ সেপাইকে অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়ে মাকিমপুরে পাঠালেন। ডোনাল্ড সাহেবের সংগে মোকাবিলা করতে হবে।

খুব খানিক মারামারি হলো। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় উভয় দলেরই কিছু লোক জখম হলো। রাণীর দলের সংগে পেরে উঠবে কেন ডোনাল্ড সাহেব। তার ভাড়া করা গুণ্ডা গা বাঁচিয়ে লড়েছিল। যুদ্ধে হার হলো সাহেবের। রাণীর সিপাই সাহেবকে বুঝিয়ে এল, তার চেয়েও শক্তিশালী লোক এ তল্লাটে আছে। নিরীহ গরীব চাষীকে ভয় দেখালেই বীর হওয়া যায় না।

ক্ষুব্ধ, অপমানিত, লাঞ্ছিত সাহেব রাণীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী

মামলা উপস্থিত করলো। তার দর্প রাণী গুড়িয়ে দিয়েছে। মামলায় রাণীর হার সুনিশ্চিত. দেশের লোকও প্রমাদ গুনলো।

কিন্তু ভাগ্যদেবী যাঁর ওপর প্রসন্না, তার হার হবে কেন? অত্যাচারী এই সাহেবের বিরুদ্ধে রাণীর অনেক সত্য প্রমাণ ছিল। অনেক সাক্ষী সাবুদ তাঁর হাতে মজুত রয়েছে। কেস সুরু হলে রাসমণি সেগুলো ঠিক ঠিক সময়ে আদালতে পেশ করলেন। ফলে মামলায় ডোনাল্ড সাহেবের চূড়ান্ত হার হলো।

এই সময় সাহেবের সংগে দেশের লোকের মামলা হলে প্রায়ই সাহেবের জিত হতো। কিন্তু সতব্রতী রাসমণির বেলায় তার ব্যতিক্রম হলো। তিনিই জয়লাভ করলেন। ডোনাল্ড সাহেবের এই পরাজয়ে নীলকর সাহেবেদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। এই ঘটনার পর আর কোনো নীলকর সাহেব রাসমণির জমিতে থেকে, তাঁরই প্রজাদের ওপর অত্যাচার করতে কখনও সাহস করেনি। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের হাত থেকে দেশীয় নিরীহ প্রজারা রক্ষা পায়।

॥ নয় ॥

মাঝে মাঝে নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে। রাসমণিরও কর্ম-প্রতিভার পরিবর্তন ঘটলো। ধর্মপ্রাণা রাসমণি এতদিন পরোক্ষ-ভাবে দেবসেবা করে এসেছেন। এখন থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে ভগবৎ-সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। সুরু হলো তাঁর জীবনের আর এক মহান অধ্যায়।

এ অধ্যায়ের কাহিনী যেমন অপূর্ব, তেমনি গৌরবের। যে জন্য রাসমণির স্মৃতি বাংলাদেশে বাঙালীর মনে চিরদিনের জন্য উজ্জ্বল হয়ে আছে। তা ঘটেছিল এই পর্বে।

কলকাতা থেকে কয়েক মাইল দূরে গঙ্গাতীরের ওপর একটি মন্দির নির্মাণ করালেন তিনি। বামন হয়ে চাঁদে হাত। শূদ্রাণী

হয়ে ব্রাহ্মণ আরাধিত দেবমন্দির স্থাপন করায় প্রচুর সমালোচনা আর সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় রাসমণিকে। সে যুগে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের ছিল পূর্ণ আধিপত্য। রাসমণি ধর্মবতী ও পুণ্যবতী মহিলা হলেও তিনি ছিলেন নিম্ন জাতীয়া শূদ্র। অশিক্ষায় ও কুসংস্কারে দেশের মানুষ তখন হীন থেকে হীনতর হয়ে চলেছে। গোড়া চরমপন্থী ব্রাহ্মণরা তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে রাণী এক অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরকে কেন্দ্র করে ধর্মের জয়যাত্রা স্থুরু হয়েছিল। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই ভারতবাসীর বহু যুগ যুগান্তরের তপস্যা আর পুণ্যের ফলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব।

সব ধর্মই সত্য। সর্ব ধর্ম সমন্বয় এবং পরম সহিষ্ণুতার এই বাণী বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার ভার নিলেন রামকৃষ্ণের মানস-সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ। সেই সঙ্গে তিনি প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও গৌরবের কথাও তুলে ধরলেন। জাতিভেদের ঘোরতর বিপক্ষে ছিলেন স্বামীজী। ধর্মের এই নবীন জয়যাত্রার অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল রাণীর জন্যই। এই প্রগতিবাদের মর্মমূলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পুণ্যকীর্তি রাণী রাসমণি। রামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র করে তাঁর শিষ্যবর্গ যে ধর্ম আন্দোলন বা জাগরণের সূচনা করলেন, তার অন্তস্থলে রয়েছেন মাতৃ স্বরূপিণী এই নারী।

এ কথা অকপটে বলা যেতে পারে যে, যদি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির তৈরী না হতো, তাহলে রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হয়তো ঘটতো না। যদি রামকৃষ্ণদেব অপ্রাশিত থাকতেন, তাহলে বিবেকানন্দের অভ্যুদয় ধর্মপ্রচারক হিসাবে হতো না। বিবেকানন্দের আগমন না ঘটলে, পাশ্চাত্যে ভারতের বাণী বহনও সম্ভব হতো না।

১২৫৫ বঙ্গাব্দে রাণী রাসমণির প্রবল ইচ্ছা হলো কাশীতে যাবার। কাশী হিন্দুদের পরম পবিত্র তীর্থস্থান। ভারতের পুণ্য সংস্কৃতির ধারক এই কাশীধাম। কাশীর মণিকর্নিকার গঙ্গায় সজ্ঞানে দেহত্যাগ

করলে মহাদেব স্বয়ং নাকি তাকে মোক্ষধামে নিয়ে যান। স্বর্গলোকে পৌঁছতে পারেন তিনি। শিব-মাহাত্ম্য ছড়িয়ে আছে বারাণসীর প্রতি ধূলিকণায়। এখানকার কল-কল্লোলিনী গঙ্গাও যেন অবিরাম শিব-সঙ্গীত গেয়ে চলেছে।

বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন এবং তাদের পূজো নিবেদনের জন্যে রাসমণির অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠল। রাণীর যখন একবার ইচ্ছে হয়েছে—তখন সেই মতো ব্যবস্থা হতে লাগল। রাণীর সঙ্গে যাবে দাসদাসী আত্মীয়স্বজন, তাঁর দেহরক্ষীর দল। দেখতে দেখতে একশটা ছোটো-বড় নৌকো এসে জড়ো হলো গঙ্গার ঘাটে। এত লোকের আহার-সামগ্রী, পোষাক-পরিচ্ছদ, জিনিসপত্র, পূজোর অজস্র উপকরণ থরে থরে সাজানো হলো।

ক'দিন ধরে কাজের খুব তোড়জোড় চললো। সমস্ত আয়োজন শেষ হলো। পরের দিন যাত্রা সুরু হবে। রাসমণি শান্তমনে রাত্রে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, জগজ্জননী মহাকালী তাঁর অপূর্ব দেবীরূপ নিয়ে রাসমণির সামনে এসে দাঁড়ালেন। দৈববাণী শুনলেন তিনি। দেবী তাঁকে বললেন—তোর আর কাশী যাবার প্রয়োজন নেই। পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর তীরে কোনো এক জায়গায় আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা কর। ঘুমের ঘোরে রাসমণি এই দেবী দর্শনে ধন্য হলেন।

চমকে ঘুম ভেঙে গেল রাণী রাসমণির।

এ কী স্বপ্ন দেখলেন তিনি!

একটু পরেই তো প্রভাত হবে। তাঁর কাশী যাত্রা সুরু হবে। সব কিছু সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আছে। কেবল তাঁর হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছে, এখন কি করবেন তিনি?

এত প্রস্তুতির পর কি করে বন্ধ করবেন তিনি এই যাত্রা? সকলের আশা আনন্দ তিনি নষ্ট করবেন কি করে? অন্য এক চিন্তায় আবার তাঁর মন দুলে ওঠে। স্বয়ং দেবী আদেশ করেছেন।

এ আদেশ লঙ্ঘন করা উচিত নয়। রুষ্ট হবেন দেবী। জগজ্জননীর ইচ্ছা কি বিফল হতে পারে ?

ক্রমে দিনের আলো বাড়তে লাগল। রাণীর যাবার কোনো তাড়া নেই। ক্রমে মনস্থির করলেন তিনি। মহাকালী মহামায়ার ইচ্ছারই জয় হোক। রাণী ঘোষণা করলেন, কাশী আর তিনি যাবেন না। তাঁর স্বপ্নকেই তিনি সত্য করে তুলবেন।

তীর্থের জন্য থরে থরে সাজানো হয়েছিল দ্রব্য সামগ্রী। রাসমণি বললেন, দরিদ্র আর ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই সমস্ত বিতরণ করে দাও। নিজের ব্যবহারে এসব দ্রব্য আর লাগাবেন না। আদেশ পালিত হলো।

দেবতার পূজার জন্য তিনি যথেষ্ট টাকা আলাদা করে রেখেছিলেন। সেই টাকার অঙ্ক কম ছিল না। দেবসেবায় ব্যবহার করার জন্য সেই টাকা রাসমণি জামাই মথুরনাথের হাতে তুলে দিলেন। এই টাকা দিয়ে দেবীর ইচ্ছামতো গঙ্গাতীরেই এক খণ্ড উপযুক্ত জমি কিনতে হবে। তারপর সেই জমিতে দেবীর জন্য একটি সুচারু মন্দির নির্মিত হবে।

জমির সন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠালেন মথুরনাথ। গঙ্গার এপারে ওপারে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মনের মতো এক খণ্ড জমি আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। জমির খোঁজ আসে, কিন্তু তা কেনা আর হচ্ছে না। যে জমি রাসমণি ও মথুরনাথের পছন্দ হয়, জমির মালিক সে জমি বিক্রী করতে রাজী হন না। আবার কোনো জমি তার মালিক হয়তো বিক্রী করবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু রাসমণি বা মথুরনাথের তা উপযুক্ত বলে মনে হয় না।

কিন্তু হাল ছাড়লেন না তিনি। অনুসন্ধান চললো, অবশেষে এক খণ্ড জমি মিললো। দক্ষিণেশ্বরে হেস্টিং সাহেবের ষাট বিঘের একটি পছন্দ সই জমি আছে। খবরটা কানে আসতেই মথুরনাথ খবরটা এনে দিলেন রাসমণিকে। হেষ্টিং সাহেব ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিং সাহেবের কাছ থেকে পঞ্চান্ন হাজার টাকা দিয়ে রাসমণি জমিটি কিনে নিলেন। ভাগীরথীর তীরে যেমন জমি তিনি খুঁজছিলেন, এখন সেই রকম জমিই পেয়ে গেলেন। জমিটি খুব পছন্দ হয়েছে রাণীর, পশ্চিম দিকে বয়ে চলেছে দীর্ঘ প্রসারিতা আনন্দময়ী গঙ্গা। স্থানটির উত্তরে সরকারী বারুদখানা, দক্ষিণে কলকাতা।

জমি কেনা হলো। এবার তিনি সাড়া জাগিয়ে মন্দির নির্মাণে হাত দিলেন। মন্দিরের নক্সা, পরিকল্পনা আরম্বরের সঙ্গেই শেষ হলো। বিলেতি কোম্পানী মেকিণ্টস এই কাজের ভার নিলে। এদের ওপর কাজের ভার দিয়ে রাসমণি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। বিদেশী কোম্পানী হলেও মেকিণ্টস ছিল খুব বৃহৎ ও বিশ্বাসী।

দেখতে দেখতে মন্দির নির্মাণ সুরু হয়ে গেল। দীর্ঘ আট বছরে অনেক শ্রমিকের কঠোর পরিশ্রমে নির্মিত হলো এই মন্দির। মনোরম গঙ্গাতীরে অপূর্ব শোভায় প্রতিষ্ঠিত হলো কালী মন্দির। তারই পাশে রাধাকৃষ্ণের মন্দির, দ্বাদশ শিব মন্দির ও নবরত্ন চূড়া।

এরই মধ্যে রাসমণি উপযুক্ত ভাস্করকে দিয়ে নিখুঁত, নিপুন দেবী-মূর্তি তৈরী করিয়েছেন। অপূর্ব সুন্দর হয়েছে কালী মূর্তি। কিন্তু দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠার এখনও যথেষ্ট দেরী আছে। কাছাকাছি মন্দির প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত শুভ দিন নেই।

রাসমণি এখন কি করবেন ?

দেব সেবার সমস্ত কাজই তাঁর সম্পূর্ণ। শুভদিন না হলে শুভ মহরৎ তো হতে পারে না। তাঁকে অপেক্ষা করতেই হবে। দেবীর যাতে কোনরূপ অঙ্গহানি না হয়, সেই জন্য মূর্তি তিনি বাক্সে ভরে রাখলেন। তালা মেরে মুখ বন্ধ করে রাখলেন বাক্সে। কিছুকাল পরে একদিন তত্ত্বাবধান করতে গিয়ে দেখলেন, আশ্চর্য! দেবীর পাষাণ মূর্তি ঘেমে উঠেছে।

অশুভ লক্ষণের আশঙ্কায় রাণীর মন চিন্তায় ভরে উঠলো। ধর্মপ্রাণা মহিলা তিনি। কোন খুঁত তিনি চান না।

শীঘ্রই রাসমণি একটা স্বপ্ন দেখলেন, দেবী তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। দেবী যেন তাঁকে বলছেন, আমাকে আর কতদিন এভাবে বন্ধ করে রাখবি। আমার যে খুব কষ্ট হচ্ছে। আমাকে প্রতিষ্ঠা কর। এবার রাসমণি খুব তৎপর হয়ে উঠলেন। দেবীর নির্দেশ। আর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করতে চাইলেন না তিনি।

তিনি উঠে পড়ে লাগলেন মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজে। অনেক বিধিবিধান ঘেঁটে ঠিক হলো ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে, বৃহস্পতিবার, বাংলা ১২৬১ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ সে দিনটি ছিল স্নানযাত্রার পবিত্র তিথি।

রাসমণি অধীর আগ্রহে শুভ দিনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। যে দিক সম্বন্ধে তিনি কোনরকম ভাবেন নি বা কোনরকম বাধা আশা করেন নি ; সেইদিক থেকে অভাবিত ও অপ্রত্যাশিত বাধা এসে ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইল তাঁর এতদিনের স্বপ্নকে, এত বছরের সাধনাকে। ব্রাহ্মণরা একজোট হয়ে বিরোধিতা সুরু করলেন। এই পর্বত প্রমাণ বাধা সরাবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নামলেন রাসমণি। দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে শুরু হলো তাঁর এক আশ্চর্য সংগ্রাম। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে যিনি পরাজয় বরণ করেন নি, তিনি এবারও এই দ্বন্দ্বে জয়লাভ করলেন। সকলের সংগে সংগ্রাম করে বিজয়ী হয়েছেন বাংলার বিজয়িনী কন্যা রাণী রাসমণি।

রাসমণি বাংলাদেশের দিকে দিকে আমন্ত্রণের চিঠি পাঠিয়েছিলেন। বিদ্বান, ভক্ত, সজ্জন সকল স্তরের ব্রাহ্মণদের তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু সব আমন্ত্রণ লিপি ফিরে এল। রাণীর সাদর আহ্বান ব্রাহ্মণেরা প্রত্যাখ্যান করলেন। স্পষ্ট করেই তাঁরা জানিয়ে দিলেন, রাসমণির পূজো এবং উৎসবে তাঁরা যোগ দেবেন না।

রাসমণির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। কেন সকলের এই সিদ্ধান্ত। সমস্ত উদ্দীপনা ও উৎসাহ নিয়ে আগত সেই স্নানযাত্রার দিনটির দিকে চেয়ে আছেন। পূজোর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ হয়ে গেছে। সকলই তিনি তাঁর সাধ্যমত জোগাড় করেছেন। অপর্যাপ্ত খরচ, অপর্যাপ্ত বস্তু-সম্ভার।

কাজের ভিড়ে রাসমণির এ কথা একদম মনে হয়নি, যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে কোনো উঁচু বংশের ব্রাহ্মণই পূজারীর পদ নেবেন না—যদিও বা পুজোর ব্যবস্থা কোনরকমে হয়. কিন্তু অন্নভোগ? কখনই কোনো ব্রাহ্মণ এ কাজে স্বীকৃত হবেন না। তিনি জাতে নীচু। তখনকার দিনে ছিল—উঁচু জাত, নীচু জাতের ভারি কড়াকড়ি বিচার।

দেবীকে অন্নভোগ নিবেদন করাই রাসমণির অনেক দিনের ইচ্ছা। ব্রাহ্মণেরা একজোট হয়ে তাঁর সেই ইচ্ছাকে ধূলোয় লুটিয়ে দেবেন। রাসমণি কিন্তু হার মানলেন না।

তিনি আবার বাংলাদেশের এবং বাংলার বাইরের নামজাদা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে ব্যাকুলভাবে মতামত চেয়ে পাঠালেন। যদি কেউ কোনো বিধান দিতে পারেন, যাতে তাঁর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু এবারেও তাঁর কাতর প্রার্থনা ব্যর্থ হলো। কেউই এমন কোনো পথের সন্ধান দিতে পারলেন না, যে পথে গেলে জাতের বাধা কাটিয়ে রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠা সফল হয়ে উঠতে পারে। বোধহয় ব্যর্থই হলো তাঁর এতদিনের স্বপ্ন আর সাধনা। নতুন করে অন্য কোন বুদ্ধি আর আসছে না রাসমণির।

রাসমণির এই অপরিসীম দুঃখের দিনে হঠাৎ একটা আশার বাণী শুনতে পেলেন যেন। গভীর হতাশায় তিনি মুষড়ে পড়েছিলেন। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোর রশ্মি দেখতে পেলেন যেন। রাসমণির কাছে এই আশ্বাসের বাণী বয়ে নিয়ে এলেন কামারপুকুরের এক চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সুপণ্ডিত রামকুমার রাসমণিকে একটা পত্র লিখেছিলেন। পত্রে তিনি সবিস্তারে সব কথা জানিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠার আগে রাণী রাসমণি যদি কোনো ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং সব রকম খরচের জন্য যদি উপযুক্ত পরিমাণ টাকার সম্পত্তিও ওই ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দেন তাহলে মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজে আর কোনো বাধা থাকবে না। ওই ব্রাহ্মণই তখন মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন এবং দেবতাকে অন্নভোগ দেবেন। কোনো ব্রাহ্মণেরই আর অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করতে শাস্ত্রের নিষেধ থাকবে না।

অল্পখ্যাত এই ব্রাহ্মণের প্রস্তাবে সংগে সংগে রাসমণি রাজী হয়ে যান। তিনি ডেকে পাঠান রামকুমারকে। অতি শ্বশ্রুই যেন তিনি দেখা করেন। রামকুমার ছোটো ভাই গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে এলেন।

এই গদাধরকেই আমরা পরবর্তী জীবনে রামকৃষ্ণদেবরূপে পেয়েছি। বড় ভাই রামকুমার রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বিগ্রহে জীবন দান করলেন। ছোট ভাই রামকৃষ্ণদেব মানব হৃদয়ের অন্তরস্থলে প্রতিষ্ঠিত করলেন এই বিগ্রহকে।

শাস্ত্রের বাধা কাটলেও সমস্যা কিন্তু দূর হলো না। রাসমণি মন্দির আর মন্দিরের লাগোয়া সমস্ত জমি নিজের কুলগুরুর নামে দানপত্র করে দিয়েছিলেন। রামকুমারের বিধান খুব পছন্দ হয়েছিল রাসমণির। পণ্ডিত রামকুমারের এই নতুন বিধানে যেমন সাহসের পরিচয় রয়েছে, তেমনি রয়েছে উদার মনের পরিচয়। অন্য ব্রাহ্মণেরা তাঁদের পুরানো সংস্কার কাটিয়ে কিছুতেই এই স্বাধীন মতটিকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারছিলেন না। শূদ্র জাতীয়া রাসমণির ঠাকুর বাড়িতে অন্নগ্রহণ করলে লোকে বলবে কি? লোকাচারের ভয় মন থেকে মুছতে পারছিলেন না।

মন্দিরের পূজোর ভার নেবার মতো সদাচারী, উপযুক্ত ব্রাহ্মণেরও দেখা মিললো না। মনের সংশয় কাটছে না কিছুতেই। রাসমণির

এই দুর্দিনে একজন ব্রাহ্মণ কর্মচারী এগিয়ে এলেন। তিনি রাণীর জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করেন। নাম মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তিনি অনেক কষ্টে বড় ভাই ক্ষেত্রনাথকে পূজোর ভার নিতে রাজী করালেন। মন্দিরের বিষ্ণু পূজোর ভার নিলেন তিনি। সমস্যা হয়তো এবার কেটে যাবে। মহেশচন্দ্র ভেবেছিলেন—নতুন পথে প্রথমে কেউ এগোতে চায় না সত্যি। কিন্তু কেউ যদি সাহস করে এগিয়ে আসে, তখন তাকে অনুসরণ করবার লোকের অভাব হবে না। কিন্তু ব্যর্থ হলো সেই ধারণা। ক্ষেত্রনাথ বিষ্ণুপূজোর ভার নিলেন, কিন্তু কালীপূজোর ভার নিতে কোনো ব্রাহ্মণই এগিয়ে এলেন না।

কি করা যায় ?

এদিকে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন এগিয়ে আসছে। হাতে মাত্র আর ক'দিন সময়। এই অন্তহীন বাধা কি শেষ হবে না তাঁর ?

মহেশচন্দ্র খুব তৎপর হয়ে ওঠেন। রামকুমারের সংগে তাঁর অনেকদিনের পরিচয়। রাসমণির কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে চললেন তিনি রামকুমারের সংগে দেখা করতে। নিরুপায় রাসমণি চিঠিতে কাতর অনুরোধ করলেন। রামকুমারকেই মন্দিরের ভার নিতে হবে। তাহলেই রাণী এক ভীষণ দায় থেকে উদ্ধার হবেন।

চিঠি নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন মহেশচন্দ্র। কিন্তু মনে তাঁর দারুণ সংকোচ। রামকুমার এই দায়িত্ব নেবেন তো। যেমন করেই হোক রামকুমারকে রাজী করাতেই হবে। তা না পারলে মুখ থাকবে না তাঁর রাণীর কাছে।

রাসমণির চিঠি পড়লেন রামকুমার। মহেশচন্দ্র তাকে বুঝিয়ে বললেন, একমাত্র তিনিই এই বিপদ থেকে রাণীমাকে উদ্ধার করতে পারন। রাসমণির সমস্ত আয়োজন কি এভাবে পণ্ড হয়ে যাবে ? কোনো ব্রাহ্মণই এ কাজে অংশ গ্রহণ করতে রাজী নয়।

রামকুমার নিজেই একদিন বিধান দিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি

রাসমণির অনুরোধ ফেলবেন কি করে? তিনি বললেন, মন্দিরের স্থায়ী পূজকের পদ তিনি নিতে পারবেন না। অসুবিধা আছে তাঁর। তবে রাসমণির মন্দিরে বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য রাণীকে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। তিনি নিশ্চিন্তে পূজোর আয়োজন করতে পারেন।

সুখবর নিয়ে দ্রুত ছুটলেন মহেশচন্দ্র। তাঁরও কম আনন্দ নয়। মনের আকাশে যে অন্ধকার জমেছিল, দমকা হাওয়ায় উড়ে গেল তা। সোনালী সূর্য কিরণে হেসে উঠলো চারদিক। রাসমণি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। আনন্দের জোয়ার বইল চারদিকে।

এসে গেল সেই জ্যৈষ্ঠের শুভদিন। দক্ষিণেশ্বরের ইতিহাসের সেই বিখ্যাত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৬২ সাল। স্নানযাত্রার পুণ্য তিথি। অসংখ্য নরনারীর জয়ধ্বনি এবং সারাদিন ধরে পূজো, হোম, পাঠ, কীর্তন, প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি কাজ চললো। অন্যদিকে ধর্মপ্রাণা রাণী রাসমণি মেতে উঠলেন দানে। সোনা, রূপা, টাকা-কড়ি কাপড়-চোপড়, গোধন কত জিনিস না দান করছেন তিনি। তাঁর দান, ভক্তি, সেবা-সমাদরের অতুলনীয় পরিচয় পেয়ে সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল। দেবালয় নির্মাণ ও এই প্রতিষ্ঠার কাজে রাসমণির নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল।

মন্দির প্রতিষ্ঠা শেষ হলো। কত বাধার পর আজ তা পূর্ণ হলো। রাসমণির বুক থেকেও পাষাণ ভার নামলো। এই আনন্দের মধ্যে রাসমণি কিন্তু তাঁর দায়িত্বের কথা ভোলেন নি। মন্দিরের সেবা যাতে চিরকাল চলতে পারে তার জন্য কুলগুরুকে উপযুক্ত পরিমাণ সম্পত্তি দান করতে হবে।

॥ দশ ॥

অল্পদিনের মধ্যেই তুলক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা নিয়ে ত্রৈলোক্য নাথ ঠাকুরের কাছ থেকে দিনাজপুরের জমিদারী কিনলেন রাসমণি। এই বিপুল সম্পত্তি তিনি মন্দিরের জন্য দানপত্র লিখে দিলেন। আর একটি তীর্থভূমি প্রতিষ্ঠিত হলো বাংলায়।

বাংলার নবদ্বীপ, বিষ্ণুপুর-ত্রিবেনী প্রভৃতি বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে কত তীর্থ, কত দেবায়তন। এদেরই সংগে উনিশ শতকে যুক্ত হলো এই নবীন তীর্থক্ষেত্র। স্বচ্ছ সলিলা স্রোতস্বিনী গঙ্গার ধারেই এই কালীমন্দির। কলকাতা থেকে এর দূরত্ব মাত্র আড়াই ক্রোশ।

প্রতিশ্রুতি মতো রামকুমার কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠার পর চলে যান নি। তিনি ঝামাপুকুর ফিরলেন না। কারণ তিনি তো মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন উপস্থিত ছিলেন এখানে। বিরাট কর্মকাণ্ড দেখেছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

দাদার এই মন্দির প্রতিষ্ঠায় গদাধরের কোনো মত ছিল না। মনে মনে বরং তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন দাদার ওপর। প্রথম জীবনে গদাধর একটু সংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন। উচ্চকুলের ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁরা। তাদের ছিল কুলমর্যাদা-জ্ঞান। তাই কোনদিন তিনি কারোর দান গ্রহণ করেননি। কোনো শূদ্রের বাড়িও পূজো করেননি।

দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত থাকলেও গদাধর কোনা জিনিস গ্রহণ করেন নি। হাত দিয়ে স্পর্শ করেননি পর্যন্ত। অনেক বেলায় যখন বেশ ক্ষিদে পেয়েছে, তখন মন্দিরের বাইরে এসে এক পয়সার মুড়ি কিনে খেলেন। দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন অনেকক্ষণ। বেলা পড়ে এলে দাদার জন্য আর অপেক্ষা না করে ঝামাপুকুরের বাড়িতে একাই চলে আসেন।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের পরিবেশটি তাঁর কিন্তু খুব ভালো লেগেছিল। কুলকুল ছন্দে বয়ে চলে ভাগীরথী। ছন্দের বিরাম নেই—শেষ নেই। এখানেই গঙ্গার তীর থেকে পূর্বদিকে উঠে গেছে কালীমন্দিরের সিঁড়ি। পূর্বমুখী হয়ে দর্শনার্থীদের মা'র মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার পর তীর্থযাত্রীদের সুন্দর বসবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই চাঁদনী রাসমণির বিখ্যাত দ্বাদশ শিব মন্দিরের মাঝখানে। এরও উত্তরে ছয়টি এবং দক্ষিণে ছয়টি শিবমন্দির বিরাজমান। এই বারোটি শিব মূর্তির পৃথক পৃথক নামাকরণও করা হয়েছে। দক্ষিণ থেকে পর পর মূর্তিগুলির নাম যজ্ঞেশ্বর, জলেশ্বর, জগদীশ্বর, নাদেশ্বর, নদীশ্বর, নরেশ্বর, যোগেশ্বর, জটিলেশ্বর, অকুলেশ্বর, নাগেশ্বর ও নির্জড়েশ্বর।

চাঁদনী ও দ্বাদশ শিব মন্দির পার হইলেই পূর্বদিকে বিশাল বাঁধানো এই আঙ্গিনার শেষে শিবমন্দিরের উল্টোদিকে পূর্ব প্রান্তে রয়েছে দুই মন্দির, একটি রাধাকান্তের, অন্যটি জগজ্জননী মহাকালীর।

এই দুই মন্দিরের মধ্যে প্রথম হচ্ছে রাধাকান্তের মন্দির। পীতবাস পরিহিত, মাল্য-শোভিত, মোহন বংশীধারী, রাসবিহারী ব্রজের গোপাল। বামে শ্রীমতীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নন্দের নন্দন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের মুখ পশ্চিমদিকে ফেরানো। উঠান থেকে উঠে এসেছে এই মন্দিরে ওঠার বাঁধানো সিঁড়ি। মন্দিরের মেঝে মর্মর পাথরে গড়া।

রাধাকান্তের মন্দিরের পরেই দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির। মন্দিরে সুন্দর পাষাণময়ী কালীপ্রতিমা। এই কালীমন্দিরের চূড়া নবরত্ন মণ্ডিত। নীচে চারিটি চূড়া। তার ওপরে মধ্যের থাকে আরো চারটি এবং সব চেয়ে ওপরে মধ্যবর্তী একটি। কেন্দ্রীয় চূড়াও বলা যেতে পারে।

কালীমন্দিরের সামনে নাটমন্দির। প্রসারিত নাটমন্দিরের

দু'দিকে উঁচু স্তর। তার ওপর ছাদ। এ ছাড়াও দক্ষিণেশ্বরের প্রসারিত পুষ্পোদ্যানে মনোরম ফুলের প্রাচুর্য। দেবসেবার জন্য কত ফুলই না ফোটে। ঝুমকো জবা, গোলাপ, কাঞ্চনফুল, অপরাজিতা, যুঁই, শিউলী। দেবী পূজার ফুলের কত সমাগম।

উৎসবের কোলাহল শান্ত হলে রাসমণি রামকুমারকে একান্ত-ভাবে ধরে বসলেন। এই পূজোর ভার তাঁকেই নিতে হবে। কিন্তু পর পর ক'দিন পূজো করলেও বরাবরের জন্য পূজোর ভার নিতে স্বীকৃত হলেন না তিনি। রামকুমার দ্বিধা করছেন দেখে রাসমণি বললেন অন্তত: যতদিন প্রকৃত পূজারী না পাওয়া যায়, ততদিন তাঁকেই পূজো চালিয়ে যেতে হবে। পূজো তো বন্ধ থাকতে পারে না।

রামকুমার কি করেন?

তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ। এ অবস্থায় তিনি চলে আসতে পারেন না। তাই তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরেই থেকে যেতে হলো। সাময়িকভাবে পূজোর দায়িত্ব ঘাড়ে নিলেন রামকুমার। তৎক্ষণাৎ আর তাঁর ফেরা হলো না।

বড় ভাইকে খুঁজতে এখানে এসে পৌঁছোলেন তরুণ গদাধর। মন্দিরে দু'ভাইয়ে দেখা হলো। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দাদাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই এসেছেন গদাধর। এই পূজোয় প্রধান অংশ নেওয়ায় তাঁদের কুলমর্যাদায় হানি হচ্ছে। তাঁদের বংশের অপমান হচ্ছে। এই মন্দিরের পূজোর ভার এক্ষুণি ছেড়ে দেওয়া উচিত।

দু' ভাইয়ে মহা তর্ক সুরু করলেন। ছোটো ভাইয়ের কথা শেষ হলে বড় ভাই তখন তাঁকে বোঝাতে সুরু করেন। তাঁর কাজে কোনো প্রকারেই বংশের মর্যাদা লাঘব হচ্ছে না, কারণ এই কাজ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত। গদাধর কিন্তু দাদার এ যুক্তি মানতে রাজী নয়। তখন মীমাংসার জন্য মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা হলো। ঠিক হলো 'ধর্মপত্র পরীক্ষা' করে স্থির করা হবে, কার মত গ্রহণযোগ্য হবে।

'ধর্মপত্র পরীক্ষা' ব্যাপারটা প্রাচীন দৈব বিশ্বাসের জ্বলন্ত প্রমাণ। যখন কোনো বিষয়ের ওপর যুক্তিতর্কের দ্বারা মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব হয় না, তখন দৈবের ওপর নির্ভর করে জানতে হয় এ ব্যাপারে দেবতার ইচ্ছা কি? কয়েকটি ছোটোখাটো টুকরো কাগজে বা বিল্বপত্রে 'হাঁ' বা 'না' লিখে পাত্রের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। তারপর কোনো শিশুকে ওই পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটুকরো কাগজ তুলতে বলা হয়। শিশু 'হাঁ' লেখা কাগজ তুললে বুঝতে হবে এ বিষয়ে দেবতার সম্মতি আছে। আর 'না' লেখা কাগজ তুললে বুঝতে হবে, দেবতার সম্মতি নেই।

দৈবের রায় কিন্তু রামকুমারের পক্ষেই গেল। ভগবানে বিশ্বাসী গদাধরের ভুল ভাঙলো বোধহয়। তিনি আর আপত্তি করলেন না। তখন চ'লে গেলেও কিছুদিন বাদে তাঁকে বড় ভাইএর কাছেই দক্ষিণেশ্বরে চলে আসতে হলো।

কিন্তু বড় ভাই-এর কাজে মন থেকে কিছুতেই সাড়া পাচ্ছেন না গদাধর, এতদিনকার সংস্কার এত চট করে মন থেকে মুছে ফেলবেন কি করে? মন্দির প্রাঙ্গণে থাকলেও মন্দিরের কোনো কিছু এমন কি প্রসাদ পর্যন্ত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন। তখন রামকুমার গঙ্গার তীরে ভাই-এর জন্য রান্নার ব্যবস্থা করলেন। পতিত পাবনী গঙ্গা। গঙ্গার পুণ্যস্পর্শে কোনো কিছু অশুচি থাকে না। ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব মেশানো একটি সবুজ মন নিয়ে তরুণ গদাধর এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। পদ্মের ছোট কুঁড়িটি হয়ে তিনি এসেছিলেন এখানে। দারুণ সমস্যার মধ্যে দোলা খেলেন কিছুদিন। দাদার মত ঠিক, না পিতা-পিতামহের আদর্শ ঠিক—পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন গোড়া ব্রাহ্মণ। এই দু'টি মতকে চট করে এক করে নিতে পারেননি গদাধর।

কিন্তু মত পরিবর্তন হলো তাঁর। দক্ষিণেশ্বরের রমণীয় পরিবেশ, প্রাণময়ী প্রতিমা, নহবৎখানার মনমাতানো ঝংকার। পঞ্চবটীর

মৌন সম্ভাষণ সব মিলিয়ে একান্তভাবে পরম পবিত্রতার মধ্যে ঢুকে গিয়ে হারিয়ে গেলেন গদাধর। আস্তে আস্তে বদলে গেলেন বিদ্রোহী অভিমানী গদাধর। কোনো মিথ্যা অভিমানের আর ধার ধারলেন না।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার পর, রাসমণির জীবনের প্রধান ঘটনাবলী এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে। ধর্ম ব্যাপারে রাণী রাসমণির কোনো গোঁড়ামি ছিল না। সংসারের সাধারণ লোক মনে করে তার ধর্মটাই সত্য,—মহৎ আর অন্য সব ধর্ম মিথ্যা। রাণী রাসমণির কিন্তু এ ধারণা ছিল না। রঘুনাথজী ছিলেন তাঁর গৃহদেবতা। কিন্তু যেদিনই তিনি স্বপ্নে মহাকালীর আদেশ পেলেন, মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সেদিন থেকেই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

আমাদের এ দেশে শক্তি সাধনায় খুব প্রবল শবরূপী শিবের বুকে পা তুলে দিয়ে লজ্জায় জিহ্বা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মহাকালী। ধ্বংসলীলায় মেতে স্বামীর বুকেই পা তুলে দিয়েছেন। লম্বা চুল তাঁর সারা পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। গলায় নর মুণ্ডমালা, হাতে রয়েছে ধারালো খাঁড়া। দীপ্ত চোখের বিদ্যুৎময়ী চাহনী শিহরণ আনে দেহ-মনে শত্রুর কাছে দেবী ভীষণা, প্রলয়-রূপিণী। কিন্তু ভক্তের কাছে তিনি মা। ভক্তকে সর্বদাই রক্ষা করেন। তাই তাঁর একহাতে খড়্গ থাকলেও অন্য হাতে বরাভয়।

দক্ষিণেশ্বরে মহাকালীর মূর্তির মধ্যদিয়ে মাতৃপূজার উদ্বোধন করলেন রাণী রাসমণি। মা—যিনি অসুর দমন করেন। অকল্যাণ নাশ করেন। ভক্তের বা সন্তানের তিনি সর্বদা মঙ্গল কামনা করেন। এছাড়াও দক্ষিণেশ্বরে দ্বাদশ শিবমন্দিরে শিব পূজোরও সূচনা হলো। কালী-কৃষ্ণ-শিব এই তিন দেবতার সমন্বয় ঘটলো এ মন্দিরে।

জমিদারীর বহু কাজেই রাসমণির নিজের সই করা শীলমোহর ব্যবহার হতো। পরে এই শীলমোহর নতুন করে তৈরী করলেন।

এই নতুন শীলমোহরে খোদাই করা হলো—"কালীপদ অভিলাষিণী রাণী রাসমণি"—এই কথা কয়টি।

সব ধর্মই সমান। সব ধর্মকেই শ্রদ্ধা করা উচিত। সকল ধর্মে সত্য, সর্ব ধর্ম মিলনের এই বীজটি প্রথম অঙ্কুরিত হলো দক্ষিণেশ্বরের এই ঠাকুর বাড়িতে।

বাংলা দেশের সকল ধার্মিক, সজ্জন ব্যক্তিই এখানে প্রণাম নিবেদন করে গেলেন। সকলেই পরিচিত হলেন দক্ষিণেশ্বরের এই মন্দিরের সঙ্গে, জ্বলন্ত ভগবৎ বিশ্বাস আর ঈশ্বরবোধে সব মানুষের সেবা, এই দুই প্রান্তের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে মূর্ত হয়ে উঠলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ক্রমে পরমহংসদেবের সাধনায় ধর্মবিশ্বাসটি আরো প্রসারিত হলো। ছোট্টো অঙ্কুর শিশুবৃক্ষে রূপ নিল।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর রাসমণির জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা হলো শ্রীরামকৃষ্ণকে আপন মন্দিরের সীমানার মধ্যে পাওয়া। এইখানেই সুরু হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল আবেগময়ী সাধনা। শ্রীভগবানকে একান্ত সত্য বলে অনুভব করা, যেমন সত্য বলে মনে হয় নিজের শরীর কিংবা আশেপাশে দেখা বা ধরে থাকা নানা মানুষ, নানা দ্রব্যসম্ভারকে। জগজ্জননী মহাকালীকে লোকে এই জগতের সৃষ্টি আর ধ্বংসের দেবী জেনে দূর থেকে তাঁকে ভয়ে প্রণাম জানায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার তাঁকে অনুভব করেছেন, আমাদের মাটির পৃথিবীর স্নেহময়ী জননী বলে।

রাকৃষ্ণদেব একদিন রাসমণিকে বলেছিলেন—জমিটি কালীমন্দিরের পক্ষে উপযুক্ত হয়েছে। কারণ দক্ষিণেশ্বরের এই স্থানটি ছিল কূর্মপৃষ্ঠ তুল্য বা কচ্ছপের পিঠের মতন, আর পাশে ছিল মুসলমানদের কবর ও গাজী সাহেবের পীরের দরগা। শ্মশানের পাশে কচ্ছপের পিঠের মতো জায়গাতেই নাকি শক্তি সাধনা বা কালীপূজা ভালো হয়। একথা বলা হয়েছে 'শক্তি-সাধনা' গ্রন্থে। এমন একটি জমি

মা'র পুজোর জন্য কিনতে পেরে রাসমণির আর আনন্দের সীমা ছিল না।

দক্ষিণেশ্বরের নহবৎখানায় বিভিন্ন সময়ে মূর্ত হয়ে ওঠে নানা রাগ-রাগিনী। এক এক সময় এক এক সুরের ঝংকার ওঠে। প্রভাতে দেবতার মঙ্গলারতির সময় বাজে এক সুর। তার পর বেলায় পুজোর সুরুতে আবার নিনাদিত হয়ে ওঠে নহবৎখানা। দ্বিপ্রহরে বিগ্রহের ভোগারতির পর বিশ্রামকালে শোনা যায় নহবৎধ্বনি। তারপর আবার নহবৎ বেজে ওঠে বিকেলে দেবতার গাত্রোত্থানের সময়। ক্রমে সন্ধ্যার আঁধার নামে দক্ষিণেশ্বরে। দেবতার সন্ধ্যারতি হয়। নহবৎতেও ধ্বনিত হয় সেই সুর। ধীরে ধীরে রাত্রি বাড়ে। বিগ্রহের শয়নারতিও শেষ হয়। শয্যা রচনা হয় তাঁর। নহবৎ ছড়িয়ে দেয় অপূর্ব প্রশান্তি আর গাম্ভীর্য।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরকে চলতি কথায় লোকে বলতো রাসমণির ঠাকুর বাড়ি। ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব ধর্মের বান ডেকেছিল। কাব্য ও সাহিত্যে তার প্রভাব পড়েছিল যথেষ্ট। কত ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেশে। তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হলো বাংলার নবদ্বীপ। ধর্মপ্রাণা রাণী রাসমণির কালী মন্দিরকে কেন্দ্র করে মাতৃপূজোর নব উদ্বোধন হলো। নতুন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হলো দক্ষিণেশ্বর। বাংলাদেশে ধর্ম সাধনার নতুন একটা ইতিহাস রচনা হলো। রাণী রাসমণিতে যা সুরু তা একটা আশ্চর্য সুন্দর পরিণতি লাভ করান শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সাধনায়।

নানা ধর্মমতের মধ্যদিয়ে সকলে এক ভগবানকেই পাবার চেষ্টা করছে। সব নদীই তো গিয়ে মিলেছে সাগরে। তাই নদী বা পথের গতিপথ বিভিন্ন হলেও সবার অন্তরে যিনি বিরাজ করছেন তিনি সকল সময়ে এক। মানুষে-মানুষে, ধর্মে-ধর্মে এই যে মহামিলনের ইংগিত, গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী বিশ্বের দরবারে

বয়ে নিয়ে গেলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বদেশ ভারতেও প্রচার করলেন এই মহামন্ত্র। ধর্ম জাতিতে ঐক্যের সাধনা আরো বড় হয়ে উঠলো।

॥ এগারো ॥

প্রধান মন্দিরগুলো ছাড়াও বাঁধানো উঠানের দক্ষিণে একতলা অনেকগুলো ঘর ছিল। এখানে দেবসেবার ধরণের ভাঁড়ার ঘর, লুচি ঘর, বিষ্ণুর ভোগঘর, মায়ের ভোগঘর, তাছাড়া আরো ছিল ঠাকুরদের রান্নাঘর, খাজাঞ্চিঘর এবং অতিথিশালা ইত্যাদি। উঠানের পশ্চিম কোণে অর্থাৎ দ্বাদশ শিবমন্দিরের ঠিক উত্তরে ছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ঘর। রামকৃষ্ণদেব যখন জননী ভবতারিণীর সেবাব্রতী হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, তখন তাঁরই চরণ ধূলিতে পূত হয়েছে এই কক্ষ। দক্ষিণেশ্বরের এই সাধকের, ভাবুকের, তীর্থযাত্রীদের চিরকালের আনন্দ নিকেতন।

রামকৃষ্ণদেবের ঘরের পাশেই গোলাপ, গন্ধরাজ, মল্লিকা, জবা, কত পরিচিত সৌরভময় পুষ্পের প্রাচুর্য। রাণী রাসমণি যখন এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন হয়তো এই শোভা, সৌন্দর্য সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। কালে কালে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে এইসব। দক্ষিণেশ্বরের বাগিচার মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় পঞ্চবটী। এখানে বট ও অশ্বত্থের দু'টি পুরণো গাছ ছিল। এরই পাশে রামকৃষ্ণদেব পরে গড়ে তুলেছিলেন তাঁর পঞ্চবটী। নিম, আমলকী, বিল্ব, বট ও অশ্বত্থ গাছের এক অপূর্ব সমাবেশ করা হয়েছিল এখানে। এখানে কুটীর নির্মাণ করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন হয়ে যেতেন।

অদৃশ্য দেবতা বা দেবীকে আমাদের চেনা জগতের সম্বোধন দিয়ে ডাকা, এ এক কঠিন সাধনার বিষয়। ভগবানকে ডাকার এই যে

কঠিন পথ, সাধারণ ভক্তরা এ পথ দিয়ে যান না। ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে হয় খুব। অনেকদিন আগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই পথে ব্যাকুলভাবে ভগবানকে পাওয়ার জন্য আরাধনা করেছিলেন নীলাচলে।

কয়েক শ' বছর কেটে গেছে তারপর। উনিশ শতকে আর একজন ভক্তকে দেখা গেল।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন এই পথে সাধনা সুরু করলেন, সাধারণ লোক তখন তাঁকে পাগল বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগল। তাঁর এই আবেগময়ী সাধনায় নানাভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করে তারা। কিন্তু বেশী বাধা ত' সৃষ্টি করতে পারে না তারা। কারণ এই ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন রাসমণি। জামাই মথুরনাথও সর্বদা সজাগ ছিলেন। তাঁদেরই সদা সতর্ক দৃষ্টির জন্য অবাধে নিজের সাধন-পথে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন রামকৃষ্ণদেব।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরে প্রথম এসেছিলেন এখানে তখন তাঁর মন বসেনি। একা থাকেন নি তিনি কোনদিন। এখানে সমবয়সী সঙ্গীর একান্ত অভাব ছিল। এর আগে তিনি নিজেদের বাড়ি বা কামারপুকুরে বা যেখানেই থাকুক না কেন কখনও তাঁর বন্ধুর অভাব হয়নি। সকলকে আপন করে নেবার একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। তার ওপর তাঁর ছিল খুব মিষ্টি গানের গলা। অল্পদিনের মধ্যেই সঙ্গী যোগাড় হয়ে যেত। এখানে প্রথম দিকে তা হয়নি।

অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মনের এই অশান্তি দূর হলো, ভাগ্নে হৃদয় এসে উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বরে। হৃদয়ের পুরো নাম হৃদয় মুখোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণেরই সমবয়সী তিনি। বেশি লেখাপড়া শেখেন নি। কলকাতায় এসেছেন চাকরীর আশায়। কাজ কারবার তো একটা করতে হবে। বড়মামা রামকুমার রাণী রাসমণির মন্দিরের পুজোর ভার নিয়েছেন। ছোটমামা গদাধরও সেখানে

রয়েছেন। তাঁরও একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। হৃদয়ের সঙ্গে এই শ্রীরামকৃষ্ণের আগেই বন্ধুত্ব ছিল। নতুন জায়গায় পুরনো বন্ধুকে পেয়ে খুশী হলেন খুব।

রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে আছেন সত্যি। কিন্তু কোনো কাজের ভার নেননি তখনও। নিজের মনে ঘুরে বেড়ান। গান করেন। মূর্তি গড়ে পুজো করেন। ধ্যানমগ্ন হন। দাদার সঙ্গে তখনও মতের মিল হয়নি তাঁর। মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেন কিন্তু তিনি পুজোর দায়িত্ব নিতে রাজী নন।

হৃদয়কে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দিন আনন্দেই কাটছিল। এমনি সময় একদিন সুন্দর মুখশ্রী সম্পন্ন আত্মভোলা এক যুবককে গঙ্গার তীরে ঘুরে বেড়াতে দেখলেন মথুরনাথ। সূর্য ঢলে পড়েছে তখন পশ্চিমে। গাছের গোড়ায় গোড়ায় আঁধারের ছায়া নেমেছে। জলের একটানা স্রোতের দিকে হয়তো তাকিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তাঁর বড় বড় চোখের শান্ত দৃষ্টি, গম্ভীর ভাব, মথুরনাথের মনে একটা ছাপ এঁকে দিল।

মন্দিরের ভেতরে এসে তিনি খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলেন, এই সুদর্শন যুবকটি কালী মন্দিরের পূজারী রামকুমারের ছোটভাই। ছেলেটির সম্পর্কে অনেক কথাই জানলেন তিনি। যুবকটি লেখাপড়া কিংবা অন্য কাজকর্ম কিছুই করে না। খুব আত্মভোলা। দেবদেবীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা।

সেদিনই মথুরনাথ রামকুমারকে তাঁর ঘরে ডাকলেন। রামকুমার এর বিন্দু-বিসর্গ জানেন না তখনও। বাবুর ডাক শুনে দেখা করতে গেলেন। কথা বলার দরকার থাকলে মন্দিরেই তো তিনি বলতে পারতেন। নিরিবিলিতে কি আর হঠাৎ আলোচনা হবে তাঁর সঙ্গে। হাতের কাজ ফেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলেন রামকুমার।

ঘরের মধ্যে অন্য আর কেউ নেই। মথুরনাথ একাই একটা চেয়ারে বসে আছেন। রামকুমারও একটা চেয়ারে এসে বসলেন।

—আপনার ভাইটিকে তো দেখে খুব শান্ত মনে হলো। মন্দিরের কাজে তো তাকে লাগাতে পারেন। বললেন মথুরনাথ।

—ও তো এখনও ছেলেমানুষ। দায়িত্ব জ্ঞানই হয়নি এখনও।

রামকুমার তাঁর ভাইকে চেনেন ভালো করে। গদাধরকে দেখতে যত শান্ত আর নিরীহ দেখায়, আসলে কিন্তু সে তত নয়। কারোর কথায় বা প্ররোচনায় পড়ে কিছু করতে রাজী নয়। নিজের কাজকর্ম সম্বন্ধে তার নিজস্ব মতামত রয়েছে। শাসন বা প্রলোভনে সে মতকে দাবানো যাবে না। ভীষণ খেয়ালী ছেলে।

কিছুদিন আগে, রামকুমার তাকে একটু বোঝাতে গিয়েছিলেন ; তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন, তাতে তাঁর স্বভাবের দৃঢ়তার পরিচয় পেয়েছেন তিনি। কামারপুকুর থেকে এনে ভাইকে নিজের কাছে রেখেছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন লেখাপড়া শেখাবেন গদাধরকে। কারণ পিতা ক্ষুদিরামের মৃত্যুর পর কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের লেখাপড়া একদম হচ্ছিল না। কলকাতায় তাঁর কিছু যজমান রয়েছে। পড়াশুনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ যদি এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন তো ভাল হয়। ভাই-এর সম্পর্কে দুশ্চিন্তাও কেটে যায় তাহলে। উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণের সন্তান। পুজো-অর্চা ছাড়া অন্য কাজ শোভা পাবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় এলেন সত্যি। দাদার কথা অমান্য করলেন না। কলকাতায় আসার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না তাঁর। দাদার কথা এড়াতে না পেরে যদিও বা এলেন কিন্তু লেখাপড়ায় মন বসলো না তাঁর। খেলাধূলা, আমোদ,প্রমোদে সময় কেটে যায় তাঁর। রামকুমার ছোট ভাইকে কিছু বলেন না, পাছে তিনি মনে আঘাত পান বা বিরক্ত হন।

শেষে একদিন আর না বলে পারলেন না রামকুমার। ভাইয়ের স্বভাবের কোন পরিবর্তন হতে না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি। একদিন ভাইকে ডেকে বললেন।

—এবার পড়াশুনার দিকে একটু মন দে।

—হ্যাঁ, দেব।

বলতে হয় বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

—ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে তুই। লেখাপড়া তোকে শিখতেই হবে। নইলে পরে খাবি কি ক'রে?

ভাইকে বোঝান রামকুমার। লেখাপড়া না শিখলে লোকে বামুনের ঘরের মূর্খ ছেলে বলে ঠাট্টা করবে। অনুতাপ আর অনুশোচনায় মন বিষিয়ে উঠবে তখন। তাই কিছু পূজো পাঠ শিখে নেওয়া তাঁর খুব প্রয়োজন। নিজের অন্ন সংস্থান যাতে ভবিষ্যতে নিজেই করে নিতে পারেন। সেইজন্য এই বয়সে পড়াশুনা তাঁকে করতেই হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভাইকে পিতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। ভালোও বাসতেন খুব। নীরবে শুনলেন দাদার কথা। কোনদিন দাদার কথা অমান্য করেননি। কিন্তু এবার আর একমত হতে পারলেন না তিনি। নিজের মত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে একটুও কুণ্ঠিত হলেন না। খুব ধীরে ধীরে সেদিন তিনি জবাব দিয়েছিলেন, যে বিদ্যা চালকলা বাঁধতে শেখায় তা তাঁর শিখতে একটুও আগ্রহ নেই। সত্যিকারের শিখতে হলে এমন বিদ্যা শিখবেন যাতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। জীবনের সব পাওয়ার প্রয়োজন মিটে যায়।

ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল বরাবর। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের একটি মানুষ। বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুব কম। নির্জনে নিরিবিলিতে ভগবানের নাম গানে মগ্ন থাকতেন বেশি। খুব মিষ্টি ছিল তাঁর গলা।

চললো লুকোচুরি খেলা। মথুরনাথ দক্ষিণেশ্বরে এলে শ্রীরামকৃষ্ণ গা ঢাকা দিতেন। তিনি মথুরনাথকে এড়িয়ে চলতে থাকেন। মথুরনাথের মনের ইচ্ছাটা তিনি জেনেছিলেন। তাঁর ওপর পূজোর

ভার দিতে চান তিনি। মথুরনাথ মানী লোক। মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলে মন্দিরের কোনো কাজ নিতে অনুরোধ করলে ঠেলতে পারবেন না তখন।

দাদা অবশ্য তাঁর মনের কথা জানিয়েছেন। ইচ্ছে না হলে কোনো কাজই তাঁকে দিয়ে করানো যাবে না। তা ছাড়া এখন তাঁর মনোযোগও নেই মন্দিরের ব্যাপারে। তাঁর ওপর এখন কোনো মন্দিরের কাজের ভার দেওয়া উচিত হবে না। তবে যদি তাঁর মত বদলায়, রামকুমার যথাসময়ে জানাবেন তাঁকে সে কথা।

মথুরনাথ বেশি জোরাজুরি করলেন না। কাজ তো তাঁর চলে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এই যুবককেই পূজারী হিসেবে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে অহেতুক চাপ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এভাবে আর বেশিদিন দূরে থাকতে পারলেন না। কারণ তাঁর মনের স্বাভাবিক গতিই ছিল ঈশ্বরের অভিমুখী। নিজের অজান্তেই ক্রমশঃ মন্দিরের কাজে ধরা পড়তে লাগলেন।

এ সময়ে ঘটলো একটি সুন্দর ঘটনা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাল মূর্তি গড়তে পারতেন। আর তা বেশভূষায় সাজিয়েও তুলতেন অপূর্বভাবে। মাঝে মাঝে নিজের খেয়ালে মূর্তি গড়ে পূজো করতেন তিনি। ধ্যানে আত্মমগ্ন হতেন।

একদিন সকালে গঙ্গা থেকে মাটি এনে শিবঠাকুর গড়তে সুরু করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সকালটা সেদিন তাঁর এই কাজেই কাটছিল। মূর্তি গড়া শেষ হলে পূজোয় বসলেন তিনি। তন্ময় হয়ে গেলেন শিবের ধ্যানে।

মথুরনাথ দূর থেকে এ দৃশ্য দেখতে পেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি অনেকদিন দেখেন না। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পেছনে এসে দাঁড়ালেন।

অন্যদিন মথুরবাবুর আসার টের পেলে গা ঢাকা দেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু আজ তিনি টের পেলেন না। তিনি ধ্যানে তখন মগ্ন ছিলেন। তাঁর কাছে কেউ এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করতে পারেন নি তিনি।

বৃষের পৃষ্ঠে মহাদেব। হাতে তাঁর ত্রিশূল আর ডমরু। চক্ষু দু'টি অর্ধনিমিলিত। মূর্তিটি ছোটো হলেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সাজ সজ্জা একেবার নিখুঁত হয়েছে। পাকা শিল্পীর নিপুণ শিল্পসৃষ্টি যেন। খুব ভালো লেগেছে মথুরনাথের।

তিনি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকেন। দেবতার ধ্যানে কতটা একাত্ম হয়ে যেতে পারলে, মানুষ এভাবে আত্মমগ্ন হতে পারেন। কোনো খেয়াল নেই। তিনি কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবেন। ফেরার সময় হৃদয়কে বললেন, পূজোর পর মূর্তিটি গঙ্গায় না ফেলে যেন তাঁর হাতে দেওয়া হয়। মূর্তিটি তিনি বাড়িতে নিয়ে যাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানের ব্যাঘাত করলেন না তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দেখার পর থেকেই তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। এই আত্মভোলা, নিষ্ঠবান, ভগবৎ বিশ্বাসী যুবকের ওপর তাঁর আকর্ষণ আরো অনেক বেশি বেড়ে গেল। মথুরনাথ ভাবতে লাগলেন এই তরুণ ব্রাহ্মণকে কি করে মন্দিরের পূজকরূপে পাওয়া যায়।

পূজো শেষ হলে কথা মতো হৃদয় শিবমূর্তিটি নিয়ে এলেন মথুর নাথের কছে। তাঁর হাতে তুলে দিলেন মূর্তিটি। এমন সুন্দর গড়ন। মথুরনাথ নিয়ে গেলেন বাড়িতে রাসমণিকে দেখাবার জন্য। মূর্তিটি রাণীরও খুব ভালো লাগে। তিনি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন এই শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। জামাইয়ের মুখে শুনলেন শ্রীরামকৃষ্ণের একাগ্রতার কথা।

রাসমণির জীবনের শেষ পর্ব শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবোন্মাদ সাধনার প্রথম সূত্র একই জায়গায় এসে মিশেছে। তাই রাসমণির জীবন

কাহিনী বলতে গেলেই বার বার শ্রীরামকৃষ্ণের কথা এসে পড়বে। রাসমণিই এই মহাপুরুষটিকে প্রথম চিনেছিলেন। তাঁর সাধনার পথ খানিকটা সহজ হয়েছিল রাসমণির আন্তরিক সাহায্যে। রাসমণি তাঁকে ঠিকই চিনেছিলেন; জহুরী যেমন জহর চেনে।

॥ বারো ॥

সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন মথুরনাথ। কয়েক মাস তো কেটে গেছে তারপর। রামকুমারও কথায় কথায় এর মধ্যে একদিন বলছিলেন, শুভ লক্ষণ দেখা গেছে গদাধরের মধ্যে। মন্দিরের মধ্যে আসে আজকাল। মনোযোগ দিয়ে পূজোর রীতিনীতি লক্ষ্য করে। কখনও একদৃষ্টে চেয়ে থাকে কালীমূর্তির দিকে। কি যেন ভাবে তখন।

সুযোগ খুঁজছিলেন মথুরনাথ। একদিন তিনি কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসছিলেন। ফটক পেড়িয়ে ভেতরে ঢুকতেই দূর থেকে তিনি দেখতে পেলেন এই সুদর্শন যুবককে। গদাধরের নাম তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ হয়নি। গদাধরকে দেখে তখুনি তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন। বিশেষ প্রয়োজন। গুরুতর বিষয়ে একটা আলোচনা আছে তাঁর সংগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, তাঁকে ডাকার কারণ কি? দক্ষিণেশ্বরে এলেই তাঁর খোঁজ করেন একবার। দেখে যখন ফেলেছেন, না গেলে তাঁকে অপমান করা হবে। তাই ভাবতে লাগলেন, যাবেন কি না? মন্দিরের কাজের ভার ঘাড়ে চাপাবেন।

ভাগ্নে হৃদয় কাছেই ছিল। তিনিও মথুরনাথকে দেখেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ইতস্তত: ভাব দেখে তিনি বিব্রত বোধ করলেন। এত বড় একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির ডাক অবহেলা করা উচিত হবে না। তিনি ছোটো মামাকে বললেন।

—ডেকেছেন যখন, না গেলে বড় খারাপ দেখাবে।

—ওখানে গেলেই তো মথুরনাথ চাকরির কথা বললেন।

—চাকরিতো করতেই হবে। না গেলে মথুরবাবু অসন্তুষ্ট হবেন। বললেন ভাগ্নে হৃদয়।

—আমি কাউকে ভয় করি নাকি? স্বয়ং মা আমার সহায়। বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

হৃদয় তখন শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝাতে থাকেন। রাণী রাসমণি এবং তাঁর জামাই মথুরনাথ, দু'জনেই খুব দয়ালু এবং উদার প্রকৃতির মানুষ। এই পুণ্য দেবভূমিতে যদি কোনো চাকরি নিতে হয়, তাতে আপত্তি করার কি আছে? দেবতার সেবা ছাড়া অন্য কাজতো তাঁকে করতে বলছেন না মথুরনাথ। তিনি এখন না গেলে রামকুমারও খুব অসন্তুষ্ট হবেন তাঁর ওপর।

হৃদয়ের কথাগুলো মনযোগ দিয়ে শুনলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এবার আর তাঁর আপত্তি থাকলো না। তিনি যেতে রাজী আছেন। পূজোর ভার নিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু সব ঠাকুর দেবতার গায়েই রয়েছে দামী দামী গয়না। পূজোর ভার নিলেও এইসব গয়নাগাটির ভার তিনি নিতে পারবেন না। ও গুলো সামলাতে গেলে তাঁর সাধনার ব্যাঘাত ঘটবে। হৃদয় যদি এসবের দায়িত্ব নিতে রাজী থাকে, তাহলেই মন্দিরের চাকরি তিনি গ্রহণ করবেন। হৃদয়ের হয়ে তিনি মথুরবাবুকে বলবেন। রাজী করাবেন তাঁকে। তাঁর কথা নিশ্চয়ই উপেক্ষা করবেন না মথুরবাবু।

হৃদয়ের খুশী আর ধরে না। হাতে আকাশ পেলেন যেন। চাকরির খোঁজেইতো দূর গ্রাম থেকে এখানে এসেছেন। একা রয়েছেন। বড় হয়েছে। চাকরি না করলে চলবে কেন? হঠাৎ এই সুযোগ এসে উপস্থিত হওয়ায় তিনি আনন্দের সংগে রাজী হয়ে গেলেন। সংগে যেতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই।

হৃদয়কে সংগে নিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন মথুরনাথের কাছে। যা

ভেবেছিলেন তাই হলো। হৃদয় ঘরে ঢুকলেন না। তাঁকে তো ডাকেন নি। তিনি বাইরে অপেক্ষা করলেন। গোবেচারীর মতো শ্রীরামকৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন মথুরবাবুর সামনে। তাঁকে বসতে বলে মথুরবাবু বললেন,

—একটা কথা আপনাকে অনেকদিন থেকেই বলবো বলবো ভাবছি।

—নিশ্চয়ই বলবেন। কেন বলবেন না।

খুব নম্র গলায় বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

—আপনার দাদার সংগে এ ব্যাপারে আমি আলোচনা করেছি। দাদার সম্মতি রয়েছে। মন্দিরের পূজোর ভার আপনাকে নিতে হবে।

বেশ জোর দিয়েই বললেন মথুরবাবু।

—দাদা কালীপূজো করছেন। আমি এখনও দীক্ষা নিইনি। শাস্ত্র মতে কালীপূজো আমি করতে পারি না।

যুক্তি টেনে কথা বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

মথুরনাথ তখন তাঁকে দেবদেবীর অঙ্গরাগ ও সাজ-সজ্জার ভার নিতে বললেন। এই অলঙ্করণ বা সাজানো গোছানো ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণ যে কত দক্ষ, মথুরনাথ তাঁর প্রমাণ পেয়েছেন সেদিনকার গড়া শিবঠাকুর থেকে। হৃদয়ের কথা তুললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মথুরনাথ সহজেই রাজী হলেন এই প্রস্তাবে।

মন্দিরের কাজে ছ'বন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয় এক সংগে যোগ দিলেন। কালীমন্দিরের ভার নিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। রামকুমার ছিলেন ওই মন্দিরের পুরোহিত। দাদার কাজে সাহায্য করতে লাগলেন তিনি। দেবীর সাজসজ্জা, বসন-ভূষণ এসবের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল তখন। ভাগ্নে হৃদয় তুই মামার প্রয়োজন মত সাহায্য করার কাজ।

মন্দিরের কাজ নেবার পর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন দেব সাধনায়। বকবক করে মা'কে যেন কি বলেন তিনি।

কখন বা দেবীকে ধমক দেন, কখন বা আবদার করেন। নিজের ইচ্ছামত বেশ মা'কে পরিয়ে দেন।

রামকুমার দেখেন। মনে হয় মা যেন হাসেন। গদাধরের কাজে কৌতুক অনুভব করেন। মন্দিরের আর কেউ না বুঝলেও, রাসমণির চোখে ধরা পড়ে এই নতুন ঠাকুরের একাগ্রতা, দেবীর প্রতি অন্তরের ব্যাকুলতা। মথুরনাথও বোঝেন ঠাকুরের আন্তরিকতা।

মথুরনাথের কাছে নালিশ যায়। রাসমণির কাছেও এই নালিশ যায়। ছোট ভটচায কোনো নিয়ম মানেন না। যা খুশী তিনি তাই করেন। দেবীকে নিয়ে ছেলেখেলা।

মথুরনাথ এই নালিশ কানে তোলেন না। তিনি বলেন, ছোট ভটচায যা করছেন, করুন। রাসমণিও জামাইয়ের কথায় সায় দেন। তিনি বলেন—মন্দিরের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে ঠাকুরকে। তোমরা তাঁকে বাধা দেবে না।

দিন যায় রাত আসে। রাত যায় দিন আসে। এমনি করে প্রাকৃতিক নিয়মে সময় চলে। পৃথিবী তার কক্ষ পথে এগিয়ে চলে কালের দিকে—যুগের দিকে। কিছুদিন কাটলো মন্দিরের বেশকারী হিসাবে গদাধরের।

রামকুমার গদাধরকে শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা দেবার কথা ভাবলেন। গদাধরের মত বদলেছে। মন্দিরের পূজারী হতে এখন আর তাঁর আপত্তি হবে না। শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা না পেলে শক্তি-পূজার অধিকার হয় না। গদাধরের ওপর দেবীর পূজার ভার অর্পণ করে রামকুমার নিশ্চিন্ত হতে চান। তার তো বয়স হয়েছে।

রামকুমার কেনারামকে ধরলেন। গদাধর বড় হয়েছেন। দেবীর প্রতি তাঁর-ভক্তিও অসীম। গদাধরকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিতে হবে।

কেনারাম রাজী হলেন। একটা শুভদিন দেখে শুভ কাজ সম্পূর্ণ হলো। কেনারাম দীক্ষা দিলেন গদাধরকে। ভবিষ্যৎ জীবনে

কালীর শ্রেষ্ঠ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন কেনারামের কাছ থেকে।

পূজা পাঠ ওখনও পর্যন্ত জানতেন না তিনি। হৃদয়ের আন্তরিকতা ঢেলে দেবীর আরাধনা করেছেন এতদিন। অন্তরের আকুলতা দিয়ে দেবীর সেবা করেছেন।

রামকুমার ভাইকে দেবী পূজা, চণ্ডীপাঠ যত্ন করে শেখাতে সুরু করলেন। দুপুরে অবসর সময়ে ভাইকে পড়ান তিনি। গদাধরের স্মরণশক্তি ছিল খুব। দাদা একবার যা বলতেন, ভুল হতো না তাঁর। গদাধর মনে রাখতেন তা, দু'বার বলতে হতো না তাঁকে।

রামকুমার মথুরনাথের সংগে আলোচনা করেন। গদাধরের হাতে তিনি পূজার ভার দিতে চান। গদাধর শক্তি-পূজার উপযুক্ত এখন। তিনি গদাধরকে সব শিখিয়ে দিয়েছেন। শক্তি বড় জাগ্রত। কোনো অনাচার-অবিচার হলে দেবীর কোপ পড়বে।

মথুরনাথ আপত্তি করবেন কেন? তিনি গদাধরকে শ্রদ্ধা করেন। স্নেহ করেন। সাধক ভক্তের হাতে দেবীর পূজার ভার পড়বে এখন থেকে। দেবী খুশী হবেন। নিজের পূজা পাওয়ার জন্যই তো দেবী শ্রীরামকৃষ্ণকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। রাসমণিও এখবর শুনে খুব খুশী হলেন। তিনি দেখা করতে এলেন মন্দিরে। রাণী রাসমণি নিশ্চিন্ত হলেন—দেবী এখন থেকে তাঁর পূজা প্রতিদিন গ্রহণ করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোনো দ্বিধা করলেন না। কোনো আপত্তি করলেন না। বরং তিনি খুশী মনেই এই গুরুদায়িত্ব মাথা পেতে গ্রহণ করলেন। তিনি পূজারী হলেন। দেবীর নিথর চোখের কোণে স্নেহ যেন ফুটে উঠল।

॥ তের ॥

বনের উড়ন্ত পাখী খাঁচায় বন্দী হলো। এবার স্বেচ্ছায় তিনি ধরা দিলেন মায়ের মন্দিরে। ভার নিলেন পূজার। গদাধর পূজারী হলেন। দিনের অনেকটা সময় তাঁর মন্দিরেই কাটে। মায়ের কাছেই তিনি পড়ে থাকেন। মায়ের সেবাই তিনি করে চলেন সর্বক্ষণ।

দাদা রামকুমার নিশ্চিন্ত হলেন। ভাই তাঁর পাকা পূজারী হয়ে উঠেছে। আর তার অস্থিরতা নেই। এবার তিনি ছুটি নিতে পারেন। বিদায় নিতে পারেন দক্ষিণেশ্বর থেকে। বয়সও তার অনেক হয়েছে। গদাধর থেকে সাইত্রিশ বৎসরের বড় তিনি।

হঠাৎ একদিন রামকুমার মারা গেলেন, গদাধর খুব আঘাত পেলেন। দাদাকে তিনি খুব ভালবাসতেন, শ্রদ্ধাও করতেন অপরিসীম। জ্ঞানতঃ দাদার অবাধ্য তিনি হননি কখনও। বিদেশে দাদার স্নেহ ছায়ায় তিনি ছিলেন।

দাদার মৃত্যুতে ক'দিন তিনি গম্ভীর ছিলেন। মন্দিরের কারোর সংগে তেমন কথা বলেন নি! ভাগ্নে হৃদয়ের সংগে পর্যন্ত প্রাণ খুলে কথা বলেন নি। এই নশ্বর পৃথিবীতে কেউ কারোর নয়! কেউ কারো অপেক্ষায় থাকে না। বেঁচে থাকাই এই পৃথিবীতে এক বিরাট বিস্ময়।

দাদার স্নেহের কত নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। প্রতি মুহূর্তে দাদার কথা মনে পড়ে। কিন্তু তিনি নেই। দাদার মৃত্যুতে গদাধর যেন আরো উদাস হয়ে উঠলেন। লোকে ভাবে দাদার শোকে বেচারা বুঝি পাগল হয়ে যাবে। সবাই সান্ত্বনা দেয়, প্রবোধ দেয়। কিন্তু কারোর কোনো কথা কানে ঢোকে না গদাধরের। গদাধর নির্বিকার।

বিশ্ব সংসার ভুলে গদাধর জগদম্বার পূজায় মন প্রাণ ঢেলে দিলেন। কোনদিকে তাঁর ভ্রূপেক্ষ থাকে না। শুধু মা আর মা।

মায়ের গানে মেতে থাকেন। সুমিষ্ট কণ্ঠের অন্তরের আকুল নিবেদন ছড়িয়ে পড়ে গঙ্গার বুকে।

মথুরনাথ উৎকীর্ণ হয়ে শোনেন সে গান। শুনতে শুনতে রাসমণি তন্ময় হয়ে যান। ভাবাবেগে কখনও কখনও নিজের সত্ত্বাকে সাময়িকের জন্য হারিয়ে ফেলেন। গানতো নয় যেন মাতৃনামের ঝরণা ধারা। এ যেন অন্তরের আকুল কামনা। এ যেন গদাধরের বুক নিঙড়ান কান্না। যে মনে এত ব্যাকুলতা, সে মন তো সাধারণ নয়। দিব্য পুরুষ, এর দর্শনেও পুণ্য আছে।

কিছুদিন যেতেই রাণীর কাছে নালিশ যেতে থাকে। ছোট ভটচায কিছু জানেন না। নিয়ম রীতি তিনি মানেন না। দেবীর মূর্তি তাঁর কাছে যেন মাটির পুতুল। যেদিন যেমন খুশী তেমন পুজো করেন। কোনো আচার নেই, নিষ্ঠা নেই। পাগলের মত প্রলাপ বকেন। দেবীর সামনে বসে কখনও কাঁদেন, আবার কখনও হাসেন। কখনও বা হাত তুলে মারতে যান। হিন্দু হয়ে দেবীর গায়ে হাত। ঘোর নাস্তিক তিনি। শূণ্য ঘরে আপন মনে বিড় বিড় করে বকে যান।

রাসমণি রোজ দক্ষিণেশ্বরে আসতে পারেন না। তাঁর ঘাড়ে দায়িত্ব তো কম নয়। কাজের চাপে তাঁকে খুব ব্যস্ত থাকতে হয়। মথুরনাথ প্রায়ই আসেন।

মথুরনাথের কাছে নালিশ করে কোনো সাড়া না পাওয়ায় রাণীর কাছে তারা অভিযোগ করলেন। বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলেন—ধর্ম রসাতল গেল। শক্তিপূজা কি এতই সহজ। অমঙ্গল সুনিশ্চিত।

মথুরনাথ মনে মনে হাসেন। গদাধরের লীলা সাধারণ লোকের বোঝবার ক্ষমতা নেই। সেই জ্ঞান-চক্ষু কোথায় এদের। শাস্ত্রের নিরস নিয়মগুলোই এরা আঁকড়ে ধরে বসে আছে।

রাণী এদের কথায় কান দেন না। বড় মুখ করে বলতে এসে মাথা নীচু করে মন্দিরে ফিরে আসে। রাসমণির এক কথা—ছোট যা করছে করুক, তোমরা কেউ কিছু বলবে না।

ভাবসাগরে এই ভাবের ঠাকুর ক্রমশই যেন তলিয়ে যাচ্ছেন, মা ছাড়া আর কোন কথা নেই মুখে, নিজের খেয়ালে মায়ের আরাধানায় মগ্ন থাকেন সর্বক্ষণ। মায়ের মূর্তির সামনে বসে কখন গানের পর গান গেয়ে চলেন; হুঁশ থাকে না সময়ের। হুঁশ থাকে না পরিবেশের। আর হুঁশ থাকে না পরিধেয় বস্ত্রের।

কেমন যেন হয়ে যান মাঝে মাঝে।

রাসমণি আসতে না পারলেও জামাই এর মুখ থেকে সব খবর সংগ্রহ করতেন। বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি খুব জড়িয়ে পড়েছিলেন এই সময়। বয়সও হয়েছে। খাটবার ইচ্ছা খুব, কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েন অল্পতেই। বড় মেয়ে পদ্মমণি তাঁর খুব অবাধ্য হয়ে পড়েছেন। মার সব কাজেই তিনি একমত হন না। মনে ভীষণ অশান্তি, রাসমণির।

শান্তি পাবার জন্য তবু তারই ফাকে ছুটে আসেন রাসমণি। গদাধরের মন কাঁপানো, ব্যাকুল করা, প্রাণ ঢালা, দরদ মেশানো গান শোনেন। "ওগো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ করো না, (ওমা) দু'টি চরণ বিনে আমার মন অন্য কিছু আর জানে না।"

গদাধরের গানের সুধায় রাণীর মনের ক্ষতে মধুর প্রলেপ পড়ে, সান্ত্বনার বাণী খুঁজে পান। আকণ্ঠ ভরে নামের অমৃত সুধা পান করেন। সময়ের জ্ঞান থাকে না। ভাবে বিভোর হয়ে যান।

রাসমণি পদ্মমণিকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। পদ্মমণি মায়ের সব কথা শুনতে চান না। পদ্মমণি হিসেবী মহিলা, তিনি পাকা গৃহিণী। দানপত্রে স্বাক্ষর করতে তিনি রাজী নন। অপর মেয়ে জগদম্বার কোনো আপত্তি নেই।

দানপত্রে যদি সব উত্তরাধীকারীর স্বাক্ষর না থাকে, তবে দানপত্র

পাকা হবে না। ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর স্বাক্ষর প্রয়োজন। দক্ষিণেশ্বরের দানপত্রের দলিলে পদ্মমণি স্বাক্ষর করতে চান না। বড় মেয়ে অবাধ্য হওয়ায় দানপত্র পাকা করতে পারছেন না রাসমণি, তাঁর সাধের দক্ষিণেশ্বর, তাঁর কল্পনার স্বর্গরাজ্য, মা মহামায়ার পীঠস্থান অনিশ্চয়তার মাঝে পড়ে থাকবে। জগদম্বা মার খুব বাধ্য। তিনি স্বাক্ষর দিতে ইতস্ততঃ করেন নি। অম্লান মনে মার অনুরোধ রক্ষা করেছেন। এই এক মেয়ের জন্য রাণীর মনে এক মহা অশান্তি দানা বেঁধে থাকে।

রামকৃষ্ণের মধ্যে আরো পরিবর্তন দেখা দিল। লোকে ভাবলো দাদার শোকে বেচারী গদাধর নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাবে। হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। কথা বলা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। পূজো শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তাঁর তন্ময়তা কাটে না। মায়ের গানে আত্মহারা হয়ে যান। রাত্রিতে পঞ্চবটীর পাশে জঙ্গলে বসে ধ্যান করেন।

রামকৃষ্ণের ওপর মন্দিরের কেউই সন্তুষ্ট নন। ক্রমশঃ তাঁরা আরো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। মথুরনাথের এটা পক্ষপাতিত্ব। কেউ কেউ ভাবেন ঠিক আছে। পাগলকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, টের পাবে এর পর। ধর্ম নিয়ে খেলা নয়। আবার কেউ ভাবেন বড়লোকের খেয়াল। খ্যাতির মোহে এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। কেউ বা গদাধরের উপর ঈর্ষান্বিত হল। বশীকরণ বিদ্যা জানেন হয়তো গদাধর।

মন্দিরের লোক ত ভাবেই, গদাধরের ভাগ্নে হৃদয়েরও মামার এই খেয়ালীপনা ভালো লাগে না। মুখে অবশ্য মামার খুব সুখ্যাতি করেন। মামাকে বিদ্রূপ করলে কাউকে ছেড়ে কথা কন না।

হৃদয়ের মনে মহা দুশ্চিন্তা দানা বাঁধতে থাকে। মামাকে সামলাবার চেষ্টা করেছিলেন খুব। সর্বদা মামার কাছে কাছে থাকেন। গভীর রাত্রে রামকৃষ্ণ জঙ্গলে ধ্যান করতে গেলে হৃদয়

ভয় দেখাতে চেষ্টা করেছেন। দূর থেকে ঢিল ছুঁড়েছেন জঙ্গলে। মামা হয়তো ভূতের ভয়ে জঙ্গলে আর যাবেন না। কিন্তু কোনো ফল হয়নি তাতে।

একদিন গদাধর পঞ্চবটী বনে গেলেন। হৃদয়ও মামার পিছু নিলেন। জঙ্গলে ঢুকবার সাহস হলো না তাঁর। মামাকে ভূতের ভয় দেখালেও নিজের কিন্তু সে ভয়টা বেশ পুরোদমেই ছিল। তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকি মারলেন।

গদাধর বসে আছেন আমলকী গাছের নীচে। তিনি দিগম্বর। পৈতে কাপড় সব খুলে ফেলে দিয়েছেন। এ দৃশ্য দেখে মনে মনে ভাবলেন হৃদয়—আর পারা গেল না। মামা নিশ্চয়ই ঘোর উন্মাদ হয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত মামা তাঁর একেবারে পাগল হয়ে গেল। মন্দিরের কাজটি বুঝি আর থাকল না? কিন্তু এমনি করে মামাকে ফেলে তো আর চলে পাওয়া যায় না। শত হলেও মামা তো। ভালমন্দ হলে আমাকেই তো দেখতে হবে।

ছেলে যেমন মায়ের সঙ্গে ব্যবহার করে, আবদারের সুরে কথা বলে, মায়ের ওপর জোর খাটায়, গদাধরের পূজোর পদ্ধতিও সেরকম হতে লাগল। যখন যে ফুল দিয়ে ইচ্ছা, যেরকম করে ইচ্ছা মা'কে সাজায়। কখনও ঝগড়া করে, কখনও বা অভিমান করে। রাগ করে হাত তোলে, আবার ছোটশিশুর মতো কখনও একনাগারে বসে কাঁদেন।

মথুরনাথ এসে মাঝে মাঝে দেখে যান। দিব্যজ্ঞানে ঠাকুর উন্মাদ প্রায়। লোকে যাই বলুক। ওদের তো জ্ঞানচক্ষু নেই। রাণী বোঝেন, আর বোঝেন মথুরনাথ। সাধারণ লোকের কতটুকুইবা জ্ঞান। অষ্ট শক্তির এক শক্তি মাথায় নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন রাণী রাসমণি। তিনি বুঝবেন না তো কে বুঝবে?

মাকে অন্নভোগ নিবেদন করা হবে। পূজো তখন চলছে। গদাধর ভাত নিয়ে দেবীর মুখের কাছে এনে বললেন—খা, খা,

তাড়াতাড়ি কর। বলে একটু পরে সেগুলো নিজেই খেয়ে ফেললেন। হাতের ওপর তখনও থালাটা রয়েছে। অনুযোগের সুরে বললেন -- এই ত' আমি খেলাম, এবার তুই খা, এ খাবার সবই তো তোর জন্য আনা।

মন্দিরের সামনে প্রচণ্ড হৈচৈ পড়ে যায়। হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ে সকলে। এ অনাচার ঠাকুর সইবে না। নির্ঘাৎ মৃত্যু। পাগল ঠাকুক তো মরবেই, সেই সাথে তাদের সকলকেও মারবে। ক্ষেপে যায় সকলে। এই মারে তো এই মারে।

হৃদয়ের যত সমস্যা। তাঁকে সকলে গালাগালি দেয়। মামাকে তিনি আগলাবার চেষ্টা করেন খুব। মামাকে তিনি ভালবাসেন খুব। লোকদের ঠেকাতে গিয়ে হৃদয় ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর সামনে কেউ গদাধরকে বিদ্রূপ করতে পারতো না। প্রতিবাদ করতেন তিনি জোর গলায়।

মামার এই কাজে তিনিও ঘাবড়ে গেলেন খুব। ঠাকুর নিয়ে খেলা। নিজের খাওয়া দ্রব্য দেবীকে নিবেদন করা যে মহাপাপ। দেবীর কোপে যে বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। মামার আর নিস্তার নেই।

মথুরবাবুকে খবর দিতে লোক ছোটে। পাগলকে প্রশ্রয় দিলে তার ফল এই হয়। গদাধর আর সুস্থ নেই। লোকটা উন্মাদ হয়ে গেছে। এক্ষুনি একে ছাঁটাই করা প্রয়োজন।

এক একজন এক একরকম মন্তব্য করে মথুরবাবুর কাছে। কাছারী ঘরে কাজ করছিলেন তিনি। নীরবে শুনলেন সব কথা। মথুরবাবু নিরুত্তর।

এদিকে মামার কথা ভেবে হৃদয় চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি সংসারী লোক। ভাবেন—একথা রাণীর কানে গেলে মামাকে আর এখানে কাজ করতে হবে না। মামার দোষ-ত্রুটি তিনি ঢাকবার চেষ্টা করতেন। এক একদিন দেবীকে না শুইয়ে দেবীর

সিংহাসনের পাশে মামা শুয়ে থাকেন। নিজের মনে ফাঁকা ঘরে কথা বলছেন।

মামাকে তিনি সাবধান করেছেন অনেক। মামার এই পাগলামো ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। আচার, নিষ্ঠা, নিয়ম, রীতি-নীতি কিছুই মানছেন না আর। পূজায় বসেন, কিন্তু শাস্ত্রমত কিছু করেন না। করেন নিজের ইচ্ছেমত।

আর বুঝি মামাকে রক্ষা করা গেল না। রাণী হয়তো মামার বেয়াদপি আর সহ্য করবেন না। তাঁর মন্দিরে বসে তাঁর ঠাকুরকেই অপমান। এঁটো অন্ন দিয়ে ঠাকুরের ভোগ নিবেদন।

॥ চৌদ্দ ॥

চারদিকে শুধু এক কথা—গেল গেল ছোট ভটচায সব নষ্ট করে ফেললো। ধর্ম আর রইল না। দেবীর পূজো, ভোগ কিছুই মানেন না তিনি। ম্লেচ্ছের মতো কাজ সুরু করেছেন।

শুধু মথুরনাথকে বলে তৃপ্ত নয় এরা। মথুরবাবু ভটচাযের দোষ দেখেন না বড় একটা। লোকটা তাঁকে নির্ঘাৎ বশ করেছেন। রাণীর কাছে ছুটে আসে। এ অন্যায়ের প্রতিকার তাঁকে করতেই হবে। এসব অনাচার চোখে দেখা যায় না। গদাধর তো তাদের শত্রু নয়! ছোট ভটচাযকে তারাও ভালবাসে, কিন্তু তা বলে অধর্মকে তো প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। দেবীর পূজা তো ছেলেখেলা নয়।

রাণী সব শোনেন। যদিও রাণী সব জানেন, সব বোঝেন। দিব্যজ্ঞানে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছে। রীতি-নীতির ঊর্ধ্বে তিনি। সাধারণ লোকের কতটুকুই বা জ্ঞান। মোহে অন্ধ, দর্পে কুটিল, লোভে অস্থির তারা।

রাণী আশ্বাস দিলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে রামকৃষ্ণকে শাসিয়ে আসবেন। প্রতিদিন এত নালিশ, এত অভিযোগ আসতে সুরু করেছে, একেবারে চুপ করে থাকলে চলবে না তাঁর। লোকে বলবে গদাধরের ওপর রাণীর পক্ষপাতিত্ব আছে। রাণীর ধর্মে-কর্মে মতি নেই। সবই লোক দেখানো। মুখে শুধু ভগবানের নাম।

রাণী বললেন—লোক যাবে। উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

সবাই খুশী। এবার আর পাগল ঠাকুরের মুক্তি নেই।

মথুরবাবু এলেন। কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপিই এলেন তিনি মন্দির দর্শনে। লোকজন সব তটস্থ। যে যার কাজে ব্যস্ত সবাই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে একজন আর একজনের ওপর।

কথা খুব কম বলেন তিনি, গম্ভীর খুব। রাসমণি আসতে পারেননি। জামাইকে পাঠিয়েছেন তিনি। মন্দির পরিদর্শন করে দেবীর দ্বারে এসে দাঁড়ালেন মথুরবাবু। পরনে ধুতি পাঞ্জাবী। গায়ে আলোয়ান।

গদাধর ভাবে বিভোর। তাঁর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কে আছে কোথায়, তাঁর তা খেয়াল নেই। দিনরাত তাঁর কিছুই জ্ঞান নেই। দেবীর সিংহাসনের কাছে বসে ছেলের মতই আবদার করেন। অভিমান করেন। কখনও বা মাকে ধমকও দেন। মাটির মূর্তি তো নয়, যেন জাগ্রত প্রতিমা। কখনও কাঁদেন, কখনও কথা বলেন দেবীর সঙ্গে।

মথুরনাথ শোনেন সে কথা। তিনি স্তম্ভিত হন। মুগ্ধ হন। দিব্যভাবের কথা শুনেছিলেন, কিন্তু চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হয়নি। সব চিহ্ন মিলে যাচ্ছে। মায়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন ঠাকুর। মথুরনাথ শিক্ষিত ইংরাজী নবীশ হলেও দেব-দেবীর ওপর তাঁর ভক্তি ছিল অবিচল। তিনি নির্বাক হয়ে যান, বাকশক্তি রহিত হয়ে যায়।

মুগ্ধ, স্তম্ভিত, আত্মবিস্মৃত মথুরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। এক দৃষ্টে তিনি দাঁড়িয়ে দেখেন। এদিক ওদিক কর্মচারীরা কান খাড়া করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বা কাজের অজুহাতে বারবার আসা-যাওয়া করছে। আজ আর নিস্তার নেই গদাধরের।

হৃদয় কাঠ হয়ে যায়। মামার কাজ তো গেলই, তাঁর চাকরিও বুঝি আর থাকলো না। মন্দিরের সবাই একজোট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছে। তিলকে তাল করে তাদের নামে আরও অনেক রঙ চড়িয়েছে নিশ্চয়ই। কাঠগোড়ার আসামীর মতো নির্বাক থাকেন হৃদয়। নিজের কাজ করে যান বিরস বদনে।

মথুরবাবু চুপচাপ এসেছিলেন, নীরবে দেখলেন সব। কপালে হাত ঠেকিয়ে শ্রদ্ধায় মাথা নত করলেন। দেবীকে প্রণাম করলেন, সেই সাথে গদাধরকেও নমস্কার করলেন তিনি। যেমনি এসেছিলেন তেমনি নীরবে চলে গেলেন আবার।

কারোর আশাই পূর্ণ হলো না। কর্মচারীরা অবাক হলেন! সেজবাবু কিছু বললেন না গদাধরকে। বরং যাবার সময় ভক্তিভরে নমস্কার জানিয়ে গেলেন। পাগলের কথা শুনে এঁরাও বোধহয় পাগল হয়ে গেছে।

রাসমণি শুনলেন সব। জামাইকে তিনি খুব বিশ্বাস করেন। তাঁর মথুর মিথ্যে কথা বলে না। মন রেখে তোসামোদ করতে জানে না। যা সত্য তাই বলবে অকপটে। মথুর তাঁর শুধু জামাই নয়, ছেলের মতো। পেটের সন্তানও হয়তো তার মার জন্য এত করে না।

রাসমণি মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানালেন রামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে। আদর্শ পুরুষ তিনি। মর্তের মানুষদের জ্ঞানচক্ষু ফোটাতে ধরায় জন্মেছেন যেন। মা'র প্রতিষ্ঠা সার্থক হয়েছে। দেবীর অশেষ কৃপা না হলে এমন পূজারী তিনি পাবেন কেন? ধন্য ছোট ভটচায, ধন্য সাধক রামকৃষ্ণ। তাঁর ডাকার আকর্ষণে মা

নেমে এসেছেন তাঁর মন্দিরে। সর্বকালের পুণ্যতীর্থ পীঠস্থান হয়ে উঠলো দক্ষিণেশ্বর। ভক্তির বান ডাকলো। রাণীর মনে আনন্দের জোয়ার এল। দেবীর পাথরের মূর্তি জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

রামকৃষ্ণের কাছে ছুটে আসার জন্য মনটা খুব ব্যাকুল হয়ে ওঠে রাণীর। হাতে অনেক কাজ। এই জরুরী কাজ ফেলে এখন কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। তবু দু'দিন পর রাসমণি ছুটে আসেন।

রাণীকে দেখে মন্দিরের কর্মচারীরা খুব খুশী হলো। তারা রাণীকে ঘিরে দাঁড়াল। নিশ্চয়ই পাগল ঠাকুরকে শায়েস্তা করতে এসেছেন তিনি। প্রত্যেকেই পাগল ঠাকুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো রাণীর কাছে। অল্পবিস্তর সকলেই ক্ষোভ প্রকাশ করলো একটু-আধটু। মথুরবাবু গোড়া থেকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন।

হৃদয় অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন। এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে তর্ক-যুদ্ধে নামবার মতো তর্কবিদ্যা তাঁর জানা নেই। অহেতুক মাঝখান থেকে তিনি রাণীর কাছে খারাপ প্রতিপন্ন হবেন।

কারোর কোনো কথায় সাড়া না দিয়ে রাসমণি মন্দিরে এলেন। পূজো শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু গদাধরের তন্ময়তা তখনও কাটেনি। বিশ্ব সংসার ভুলে জগদম্বার পূজোয় মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন তিনি। হৃদয় এক ফাঁকে এসে মামাকে খবর দিয়ে গেছেন। রাণী এসেছেন মন্দির দর্শনে। কথাটা হয়তো গদাধরের কানে যায় নি। তাঁর মন হয়তো তখন কোন্ অসীমের আকর্ষণে হারিয়ে গেছে। তাঁর চেতনা হয়তো লোপ পেয়েছে। মায়ের ধ্যানে বিভোর হয়ে আছেন তিনি।

রাণী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। মায়ের এ একনিষ্ঠ সেবককে তিনি আকুলতা দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন। তাঁকে তক্ষণি কলকাতায় ফিরতে হবে। রামকৃষ্ণকে ডেকে তিনি তাঁর ধ্যান ভাঙলেন না। কর্মচারীদের ওপর আবার তিনি কড়া আদেশ দিলেন —ছোট ভটচায যা খুশী করবে, তার কাজে কারোর বাধা দেওয়া

চলবে না। যে তাঁকে বিরক্ত করবে, তিনি স্বহস্তে তাকে শাস্তি দেবেন।

রাণীর এই নির্দেশে কর্মচারীরা খুব অবাক হয়ে যায়। ভয়ও পায় তারা। মথুরবাবুর মতো রাসমণিও এসে একই আদেশ দিয়ে গেলেন। অদ্ভুত ব্যাপার!

হৃদয় যেমনি অবাক হলেন, তেমনি খুশীও হলেন মনে মনে। মামাকে এ মন্দির থেকে কেউ সরাতে পারবে না আর। নালিশ করতে গেলে উল্টো ফল হবে। আর দুশ্চিন্তার কারণ সেই। খুব ভালোই হলো। এবার কেউ কিছু বলতে এলে বেশ কড়া করে দু'কথা শুনিয়ে দিতে পারবেন। আর তো তাঁকে ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে না। সেজবাবু মামাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। স্বয়ং রাণীমা তাঁর মামার পক্ষে রয়েছেন। চুনোপুঁটির কথা কানে না তুললেই চলবে।

॥ পনের ॥

সমস্ত জগৎ আজ রাণী রাসমণির নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। ঠাকুরের মর্তলীলার সহচরী হিসাবে তিনি অমর হয়ে আছেন আজো মানুষের মনে। ঠাকুরের চরম সিদ্ধিলাভে রাণী রাসমণি ছিলেন অন্যতম সহায়। তিনি রামকৃষ্ণের সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন, দৃঢ় হাতে তাঁর সাধন পথের বাধা দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সতর্ক দৃষ্টির জন্য কোনো চক্রান্তের জাল দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। তাঁর মতবাদ এবং ভগবৎ প্রেম ছিল অটুট। রাণী ছিলেন অসামান্যা। ছোট ভটচাযকে তিনি প্রকৃতি মায়ের সাধক রূপে চিনতে পেরেছিলেন।

রাণীর কড়া নির্দেশে কর্মচারীরা দমে যায় খুব। তাঁরা আর অহেতুক গোলযোগ করতে একজোট হয় না। হৃদয়ের সংগে তাদের

ঝগড়া লাগে না। হৃদয় ভাবেন, তাঁর মামা সাধারণ মানুষ নন। মামাকে তিনি যা ভেবেছেন, তা হয়তো নয়। মথুরবাবু শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক। অনেক জানেন। এত বড় জমিদারী চালাচ্ছেন, বিরাট ব্যবসার তদারক করছেন—তাঁর চোখে ধুলো দেয়াতো সহজ কথা নয়।

গদাধরের সুখ্যাতি তখন বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। একজন সিদ্ধপুরুষ হিসাবে তাঁর খুব নাম-ডাক। অনেক লোকের সমাগম হয় দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে।

জগৎ সংসারের ত্রাণকর্তা গদাধর হলেন রামকৃষ্ণ। কে দিল এ নাম? কেউ কেউ বলেন পরম ভক্ত মথুরনাথ এ নাম রেখেছিলেন গদাধরের। রাণী রাসমণির কাগজপত্রে লেখা হয় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। ঠাকুরও অবশ্য সে কথা বলেন—মথুরবাবু লিখতেন রামকৃষ্ণ বলে। সৌম্য শান্ত এই মানুষটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ তখন অনেকেই।

রাণীর বরাদ্দ লিপিতে 'রামকৃষ্ণ' নামের উল্লেখ আছে।

১৮৫৫ খৃঃ—১২৬১ সাল

শ্রীশ্রীকালী—	কাপড়—
শ্রীরামতারক ভট্টাচার্য —৫৲	রামতারক ৩ জোড়া—৪॥০
শ্রীরাধাকান্তজী	রামকৃষ্ণ ৩ জোড়া—৪॥০
শ্রীরামকৃষ্ণ ভাট্টাচার্য—৫৲	হৃদয়রাম ৩ জোড়া—৪॥০
পরিচারক	খোরাকীসিদ্ধ চাউল—/॥০
শ্রীহৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় ৩॥০	ডাল /৵০ পোঃ, পাতা ২ খানি, তামাক ১ ছটাক, কাষ্ঠ /২॥০

আবার কেউ কেউ বলেন, তোতাপুরী প্রথমে গদাধরের নাম রামকৃষ্ণ রাখেন। কিন্তু তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে আসেন বাংলা ১২৭১ সালে। তাঁর অনেক পূর্বে ১২৬২ সালে ঠাকুর যখন রাধাকান্তজীর মন্দিরে পূজারী, তখন থেকেই রাণী রাসমণির বরাদ্দ লিপিতে লেখা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ভটচায বলে।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি মত চালু আছে। কেউ বলে ভৈরবী এ নাম রেখেছেন গদাধরের, ১২৬৮ সালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন। নাম নিয়ে যতই তর্ক হোক, রামকৃষ্ণ এখন মোটেই সুস্থ নন।

ঠাকুরের প্রায় উন্মাদ অবস্থা। জলে গলা ডুবিয়ে বসে থাকেন। গায়ে জ্বালা। মথুরবাবু চিন্তিত হয়ে পড়েন। চারদিকে লোক ছুটলো। ভালো কবিরাজ চাই। গঙ্গাপ্রসাদ সেন এলেন। দেখলেন রামকৃষ্ণকে। তিনি বললেন—সারাবার চেষ্টা করবো। মারাত্মক বায়ু রোগ।

এই সময় দক্ষিণেশ্বর এলেন ভৈরবী। গৈরিকবসন ব্রহ্মচারিণী ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী। ভৈরবী এসে দাঁড়ালেন মন্দির প্রাঙ্গনে। সংগে মথুরবাবু। রামকৃষ্ণ বসে আছেন। পাগল মানুষ। নিজের খেয়ালেই বসে থাকেন।

ভৈরবী দেখলেন আগ্রহ ভরে, পাগল! কে বলে পাগল? ভৈরবী মথুরবাবুকে বললেন, কে বলে বায়ু রোগ? এতো দেখছি মহাভাব। এ ভাব সকলের হয় না। হয়েছিল শ্রীরাধার। আর হয়েছিল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের। ইনি অবতার। কলির দেবতা।

ভৈরবী স্থান কাল ভুলে গেয়ে উঠলেন—

'করতালি দিয়া মাগী নেচে নেচে বলে।
এইত গৌরাঙ্গ দেব নিতাইয়ের খোলে॥
হৃদয় আনন্দময় তাহার উচ্ছ্বাসে।
যথা তথা পুরীমধ্যে এই বার্তা ঘোষে।
এই রামকৃষ্ণ সেই গৌর গুণধাম।
সাব্যস্ত সহস্র দেয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥

মথুরনাথ রামকৃষ্ণকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। ভালও বাসেন। রামকৃষ্ণের সংগে তিনি একদিন কথা বলছিলেন। সময় আর সুযোগ পেলে তিনি মন্দিরে চলে আসতেন। রামকৃষ্ণ মথুরনাথকে বললেন—জানিস, ভগবান ইচ্ছা করলে সব কিছু করতে পারেন।

রামকৃষ্ণ সকলকেই তুই-তোকারী করে কথা বলতেন। আপনি তুমির ধার দিয়ে একবারও হাটতেন না। বিরক্ত হলে শালা সম্বোধন করতেন। ছোট বড় কেউই বাদ যেত না।

রামকৃষ্ণের সব কথাই অন্ধের মতো বিশ্বাস করতেন। যুক্তি-তর্কের ধার ধারতেন না। ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপ যুক্তির দ্বারা বিচার করা যাবে না। বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসের মাত্রাটাই বাড়বে তাতে। কি খেয়াল বশতঃ সেদিন তিনি ঠাকুরকে বললেন,

—আপনার ভগবান ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন?

—আলবাৎ পারেন।

বেশ জোর দিয়ে বললেন রামকৃষ্ণ।

—বেশ।

অদূরে একটা জবা গাছ দেখা যাচ্ছিল। টকটকে লাল জবা ফুটেছে অনেক। পাতা দেখা যায় না। এই জবা গাছটা দেখিয়ে মথুরবাবু বললেন,

এ গাছের একটা ডালে এই লাল জবার সাথে সাদা জবা ফোটাতে পারেন আপনি?

মথুরবাবু মুখ টিপে টিপে মুচকি হাসলেন।

—পারিরে শালা পারি। কাল ভোরে আসিস। আমার মা সব পারেন।

রামকৃষ্ণের গলা দ্বিধাশূণ্য। এ যেন একটা খুব সহজ কাজ।

কথা আর না বাড়িয়ে চলে গেলেন মথুরনাথ। কাল ভোরে এসে কি দেখবেন কে জানে? রামকৃষ্ণ তো মিথ্যে কথা বলেন না। এ অসম্ভব ঘটনা কি করে সম্ভব হবে। ভীষণ এক চিন্তার মধ্যে পড়েন তিনি। পরের দিন ভোর হতেই মথুরবাবু ছুটে এলেন। জবা গাছের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

একি দেখছেন তিনি? স্বপ্ন দেখছেন নাতো? চোখ রগড়ে নিয়ে আবার দেখলেন মথুরনাথ। না, একই দৃশ্য। না, কোনো

ভুল নয়, এক বোঁটায় দুটি ফুল, একটি লাল ও একটি সাদা। অন্য ডালে আগের মত লাল ফুল ফুটেছে প্রচুর।

মথুরনাথ ছুটে এলেন রামকৃষ্ণের কাছে। পায়ের ধুলো নিলেন তিনি ছোট ভটচাযের।

—কিরে শালা, কি দেখে এলে?

রামকৃষ্ণ গঙ্গার তীরে বসেছিলেন। প্রভাতের শান্ত সমীরণে মায়ের নাম গান করছিলেন তিনি।

—আপনার কথা কাল আমি বিশ্বাস করিনি, তার জন্য খুব অনুতপ্ত।

মথুরবাবু বললেন তাঁকে।

—দেখলি তো এখন। ভগবান ইচ্ছে করলে সব পারেন।

রামকৃষ্ণের মুখে একটা খুশীর হাসি খেলে গেল।

রাণী রাসমণি খুব ভাবেন, তিনি জীবিত থাকতে থাকতে মন্দিরের একটা নির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা করে রাখা প্রয়োজন। মৃত্যু তো মানুষকে জানিয়ে আসে না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁর যত দুশ্চিন্তা। তাঁর অবর্তমানে রামকৃষ্ণের কি হবে? ঠাকুর কষ্ট পাবেন খুব। হয়তো পূজো বন্ধ হয়ে যাবে।

দশ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি ঠাকুরের নামে দলিল করে দিলেন রাণী। আর তাঁর চিন্তার কারণ নেই। দানপত্রটি নিয়ে মথুরবাবু এলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের হাতে তুলে দিলেন দলিলটি।

রামকৃষ্ণ প্রথমে বুঝতে পারেননি ব্যাপারটা। তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন। পরে দলিলটি ছুঁড়ে ফেললেন মাটিতে। ঠাকুর বাঁশ তুলে তেড়ে এলেন,

—তবে রে শালা, আজ তোর মাথা গুঁড়ো করে ফেলবো। আমাকে বিষয়ী করতে চাস।

মথুরবাবু দু'পা পেছনে সরে এলেন। তার লোকজন হাঁ-হাঁ করে উঠল। কেউ কেউ মারমুখো হয়ে এগিয়ে আসে। মথুরবাবু হাতের

ইশারায় তাদের থামতে বললেন। বৃথাই তারা ঠাকুরের ওপর উত্তেজিত হচ্ছে। দলিলটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে হাত জোর করে মথুরবাবু সামনে দাঁড়ালেন,

—আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

ঠাকুর বাঁশ নামালেন। শান্ত হলো অগ্নিমূর্তি।

জানবাজারে বসে রাণী শুনলেন সব কথা। ঠাকুরকে তাঁরা সত্যিই চিনেছেন। বহু সুকৃতির ফলে তাঁরা এই পরম পুরুষকে পেয়েছেন। তিনি ঠাকুরের সাথে দেখা করতে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। তিনি খুব বেশি আসতে পারেন না।

ক'দিন বাদে মথুরবাবু এলেন খুব বিমর্ষ বদনে। তাঁর স্ত্রী জগদম্বা অসুস্থ। স্ত্রী তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়। জগদম্বার শুকনো মুখ তিনি একদম সহ্য করতে পারেন না। তাঁর অন্তর ব্যাকুল হয়ে ওঠে তখন।

অসুখটা ক্রমশই বেড়ে চললো, কলকাতার কোনো ডাক্তার কবিরাজ তিনি বাদ দিলেন না। দেশী-বিদেশী সকলকেই বাড়িতে ডেকে আনলেন। চিকিৎসা চললো পুরোদমে। কিন্তু রোগ সারার কোনো লক্ষণ নেই। কিছুতেই কিছু হয় না।

মায়ের প্রাণ, স্বামীর মন, যে যা বলে তাঁরা তাই করেন, ওষুধ পথ্যের ত্রুটি নেই। কিন্তু জগদম্বার কোন উন্নতি হয় না। দিনে দিনে অসুখ বাড়তেই থাকে। অবস্থা এমন হলো যে বাঁচার আর আশা রইল না। প্রদীপের ক্ষীণ শিখার মতো প্রাণটুকু সম্বল রইল দেহে। যে কোনো মুহূর্তে নিভে যেতে পারে প্রাণের স্পন্দন। শেষ মুহূর্তের জন্য সবাই প্রস্তুত এখন।

রাণীর চোখে ঘুম নেই। সময় মতো খাওয়া হয় না। কন্যার শিয়রে অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে থাকেন তিনি। একটি কন্যা তাঁর মারা গেছে আগে। ভগবানের পায়ে শত কোটি প্রণাম জানান। অন্তরের আকুলতা দিয়ে তাঁর নাম গান করেন।

মথুরবাবুর মনের অবস্থাও তাই। চোখে ঘুম নেই। মনে শান্তি নেই। যতবারই জগদম্বার শেষ মুহূর্তের কথা মনে পড়ে—রামকৃষ্ণ চোখের সামনে এসে দাঁড়ান। বেশ স্পষ্টই দেখতে পান যেন। একবার দু'বার নয় প্রতিবারই একটা ছায়া মূর্তি তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠেন। রামকৃষ্ণ যেন দু'বাহু প্রসারিত করে তাঁকে কাছে ডাকছেন। শান্ত হতে বলছেন। মন তাঁর প্রবোধ মানে না।

রাসমণিও দেখেন সেই একই মূর্তি। চোখ বুজলেই অন্তর দৃষ্টিতে দেখতে পান রামকৃষ্ণকে। সেই সৌম্য শান্ত আদর্শ মানুষটি যেন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। রাণী আর নীরব থাকতে পারলেন না। জামাইকে বললেন সে কথা।

মথুরনাথ আর স্থির থাকতে পারলেন না। অনেকদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর যাওয়া হয়নি। হয়তো ঠাকুর তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। বারবার এই দেখা দেওয়া কেন? মুমূর্ষু পত্নীকে রেখে তিনি ছুটলেন দক্ষিণেশ্বরে।

মন্দিরের গায়ে হেলান দিয়ে রামকৃষ্ণ বসেছিলেন। মথুরবাবু এসে দাঁড়ালেন সামনে।

—এসেছিস যখন মাকে প্রণাম করে যা। কোনো চিন্তা নেই। দেখ্‌গে ভালো হয়ে গেছে।

রামকৃষ্ণ আপন খেয়ালে বলে উঠলেন।

মথুরবাবু অবাক। অবাক হ'বারই তো কথা। তিনি তো এখনও কিছু জানান নি। ছোট ভটচায কি অন্তর্যামী? রামকৃষ্ণ মানুষ নন্। দেবতা। তিনি রামকৃষ্ণের পা ধরে প্রণাম করলেন। রামকৃষ্ণ তাঁকে দু'হাত দিয়ে সরাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি পারবেন কেন মথুরবাবুর সংগে।

দেরী না করে বাড়ি ফিরলেন মথুরবাবু। বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁর প্রিয় জগদম্বা উঠে বসেছে। এখন অনেক সুস্থ। যাবার সময় পর্যন্ত জগদম্বা তাঁর সংগে একটি কথাও বলতে পারেনি। নড়বার

ক্ষমতা তার ছিল না। কি করে এ অসম্ভব কাজ সম্ভব হলো? ঠাকুর তো কোনো ওষুধ দেননি তাকে। শুধু মুখের কথায় এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে ভালো হলো? মানুষের কর্ম নয় এটা। স্বয়ং ভগবান যাঁর কাছে ধরা দিয়েছেন, তাঁর অসাধ্য কি থাকতে পারে?

এই ঠাকুর, একবার শ্রীমা অসুস্থ হয়ে পড়লে খুব কাতর হয়ে পড়েছিলেন। প্রাণ ঢেলে তিনি তখন সেবা করেছিলেন শ্রীমা'র। কন্যার প্রতি জামাইয়ের এই কর্তব্য বোধ দেখে শ্রীমার বাবা খুব খুশী হয়েছিলেন।

—কে বলে আমার জামাই পাগল? আমার জামাই আদর্শ স্বামী। বহু ভাগ্যে আমার সারু মা এমন স্বামী পেয়েছে।

এই সময় ঘটলো এক অঘটন। সারা মন্দিরের প্রতি মানুষের টনক নড়ে উঠলো। কি করা যায় এখন? কি করা উচিত হবে? পূজারী ক্ষেত্রনাথ বোবা হয়ে গেছেন একেবারে।

সেদিন ছিল স্নানযাত্রার দিন। বাগা গোবিন্দের মন্দিরের পূজারী মূর্তি নিয়ে যাচ্ছিলেন গঙ্গার ঘাটে। ঠাকুরকে স্নান করাবেন তিনি। সকাল থেকে বৃষ্টি হ'চ্ছিল। পথঘাট জলে ভিজে গেছে। মাটি ভীষণ পিছল হয়েছে। কোথাও শ্যাওলা, কোথাও বা কাদা হয়েছে।

ক্ষেত্রনাথের হাতে গোবিন্দের মূর্তি। অতি সযত্নে তিনি পথ দিয়ে হাটছিলেন। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলেন তিনি। মূর্তি হাত থেকে ছিটকে গিয়ে পড়লো মাটিতে। নিজের ব্যাথা ভুলে ক্ষেত্রনাথ চটপট উঠে পড়েন।

চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে যায়, ছুটে আসেন অনেকে, কী সর্বনাশ। একী অলক্ষুণে কাণ্ড। দারুণ অমঙ্গলের চিহ্ন। ভগবান নিশ্চয়ই রুষ্ট হয়েছেন কারোর ওপর। ভালয় ভালয় এখন বছরটা কাটলে হয়।

গোবিন্দের একটি পা ভেঙে গেছে। সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। ক্ষেত্রনাথ ভয়ে কাঁপতে থাকে। দুর্ভাবনায় তাঁর

প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ক্ষেত্রনাথের মুখে কোনো কথা নেই। তিনি একেবারে নির্বাক।

তুমুল আলোড়ন পড়ে যায়। খবরটা সংগে সংগে রাণীর কাছে গিয়ে পৌঁছয়। খবর পেয়ে রাসমণি জানবাজার থেকে ছুটে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় তাঁর মন অস্থির হয়ে ওঠে। কিছুদিন আগে তাঁর এক মেয়ে কঠিন অসুখ থেকে উঠেছে। আবার হয়তো কোনো অশুভ ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে তাঁকে।

ক্ষেত্রনাথ মাথা নীচু করে এসে রাণীর সামনে দাঁড়ান। যা হবার হয়ে গেছে। খুব সাবধানেই তিনি হাটছিলেন। ভাগ্যের লিখন খণ্ডাবে কে?

মাথা গরম হলেও রাণীর বিবেচনা-বুদ্ধি লোপ পেত না। বুঝলেন—এটা একটা দুর্ঘটনা। ক্ষেত্রনাথ নিরপরাধ। যে কেউ জল কাদায় পা পিছলে পড়ে যেতে পারতো। ক্ষেত্রনাথকে তাই তিনি কিছুই বললেন না।

বৈষ্ণবাচার্যদের সভা বসলো। তাঁরা একবাক্যে রায় দিলেন, ভাঙ্গা মূর্তির পূজা হতে পারে না। গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া উচিত। নতুন মূর্তি স্থাপন করতে হবে সিংহাসনে। শাস্ত্রের বিধান মেনে শাস্ত্রমতেই নির্দেশ দিলেন রাণীকে।

রাসমণির মনঃপুত হল না সেই বিধান। এ আদেশ মেনে নিতে তাঁর মন চায় না। এতদিন যাঁকে গোবিন্দ জ্ঞানে পূজো করলেন, তাঁকে বিসর্জন দেবেন কি করে? গোবিন্দ বিসর্জন দিলে আর বাকি রইলো কি? খুব নির্মম বলে মনে হল এই নির্দেশ।

রাসমণির মনে হলো—রামকৃষ্ণ কি বলেন এ প্রসঙ্গে? তাঁর মত নেওয়া খুব প্রয়োজন। তিনি তো নিজে কোন ব্যাপারে মাথা ঘামান না। নিজের খেয়ালে বিভোর সর্বক্ষণ। তিনি জীবন্ত বিগ্রহ। তিনি যা নির্দেশ দেবেন, তাই মেনে নেবেন রাসমণি।

নিরালায় রামকৃষ্ণের কাছে এসে বসলেন রাণী। জানালেন তিনি তাঁর মনের অভিপ্রায়। পণ্ডিতদের বিধানের কথাও বললেন তাঁকে।

এক মনে প্রথমে শুনলেন রামকৃষ্ণ। তিনি বললেন—পড়ে গিয়ে তোমার কোন জামাইয়ের পা ভাঙলে কি করতে তুমি? আর একটা নতুন জামাই আনতে, না, পা সারিয়ে নিতে?

তাইত! এই সহজ কথাটা তাঁর মাথায় আসেনি। রাসমণির মনের উদ্বেগ দূর হলো। রামকৃষ্ণ তো ঠিক কথাই বলেছেন। সত্যিই তো, জামাইয়ের পা'টা সারিয়ে নিতেন তখন। তাকে ত্যাগ করার কথাই আসে না।

রাসমণি রামকৃষ্ণকে ধরে বসলেন। তাঁকেই সারাতে হবে। ভাঙা পা নিখুঁতভাবে জোড়া লাগিয়ে দিতে হবে। দেখে যেন কেউ বুঝতে না পারে।

রামকৃষ্ণের শিল্পপ্রতিভা ছিল অদ্ভুত।

বৈষ্ণবাচার্যদের অভিমান হলো। তাঁরা ক্ষুণ্ণ হলেন। তাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ। তাঁরা পণ্ডিত। তাঁদের নির্দেশ অবহেলা করলেন রাণী। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। রাণীর দেওয়া মাসোহারা, সিধে এগুলি কম নয় চলার পথে।

রামকৃষ্ণকে অতি সম্মানের সংগে রাণী তাঁর জানবাজারের বাড়িতে এনে তুললেন। অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হলো এতদিনে। মানুষটিকে তিনি নিজের হাতে সেবা করবেন। কাছে বসে খাওয়াবেন। নিরিবিলি ধর্মালোচনা করবেন।

আত্মলোভা মানুষ। তন্ময় হয়ে থাকেন প্রায়ই। কখন কথা বলেন, কখন ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। মথুরবাবু, শ্রীজগদম্বা আর রাণী রাসমণি রামকৃষ্ণের অনুগত ভক্ত। জীবন্ত বিগ্রহের মতো শ্রদ্ধা করেন তাঁরা।

অঘটন ঘটলো হালদারকে নিয়ে। হালদার হ'চ্ছেন রাণীর বাড়ির পুরোহিত। জানবাজারের জমিদার বাড়ির পুরোহিত তিনি। দাপট কম হবে কেন? তাঁর ভীষণ অহঙ্কার।

হালদার মশাই শুধু অহঙ্কারী নন, তার স্বভাবটাও ছিল খুব হিংসুটে। লোভও ছিল খুব। এই আধপাগলা লোকটার এত

খাতির যত্ন সহ্য হলো না। আদর ও যত্নের ঘটা দেখে তাঁর খুব হিংসে হলো। রাণী, জামাই, মেয়ে সকলেই হাত জোড় করে রয়েছেন। কখন পাগলা কি বলে সে কথা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব তাঁরা। গুরুকেও মানুষ এত খাতির করে না এক এক সময়।

রামকৃষ্ণকে দেখার পর থেকেই হালদারের চোখে ঘুম নেই। অনেক ভেবেচিন্তে হালদার মশাই ঠিক করলেন—এ পাগলা নিশ্চয়ই মন্ত্র জানে। হতভাগা পাগলাটা শেষ পর্যন্ত পুরোহিত না হয়ে বসে। এ লোকটির জন্য তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি সব নষ্ট হয়ে যাবে। একবার সুবিধা মতো বাগে পেলে বশীকরণ মন্ত্রটা শিখে নেবেন তিনি।

কিন্তু সুযোগ পাওয়া মুস্কিল। একা পাওয়া যায় না তাঁকে। রাণী, জামাই, মেয়ে কেউ না কেউ কাছে কাছে থাকেন। হালদার মশাই ও ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ান। তিনিও তালে তালে থাকেন।

সুযোগ একদিন এসে গেল। রামকৃষ্ণ বসে আছেন বৈঠকখানায়। কি ভাবছেন কে জানে। তন্ময় ভাব। সুযোগ পেয়ে হালদার তেড়ে এলেন্। শূন্যে আকাশের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়েছিলেন ঠাকুর। কদিন ধরে নিজের হাতে মায়ের পূজো দিতে পারছেন না। মনটা রামকৃষ্ণের এমনিতেই অস্থির হয়ে উঠেছে।—এই পাগলা বামুন।

হালদার খুব রেগে গেছেন তাঁর ওপর।

রামকৃষ্ণের কানে এ কথা পৌঁছল না। তিনি তখন ভাবে বিভোর। ভীষণ তন্ময়।

হালদার আরো রেগে গেলেন। ভাবলেন তাঁর কথা কানে নিচ্ছে না। গ্রাহ্য করছে না তাঁকে!—আমরা আর মানুষ নয়, না। রাজা, রাণী ছাড়া বুঝি কথার যুগ্যি আর কেউ নয়।

রামকৃষ্ণ কোনো উত্তর দিলেন না। রামকৃষ্ণের নীরবতায় হালদারের রাগ আরো বেড়ে গেল।

—কালা নাকি? কথা কানে যাচ্ছে না নাকি? একা খাবি বুঝি সব? সেটি হচ্ছে না। আমাকে ভাগ দিতে হবে। নইলে ব্যবসার গণেশ উল্‌টে দেব। আমি এ বাড়ির পুরোহিত।

কথা বলার মোটেই ইচ্ছে নেই রামকৃষ্ণের। তারপর এ ধরণের কথা শুনতে অভ্যস্ত নন। কি জবাব দেবে এর।

রাগে ফেটে পড়লেন হালদার।

—তবে রে শালা। কথার জবাব দিবিনে। তবে দেখ।

রামকৃষ্ণকে ধাক্কা দিয়ে মেজেয় ফেলে লাথি মারতে মারতে হালদার আবার বললেন—দেখ শালা, কেমন লাগে। মন্দির হাতিয়ে আবার এখানেও হাত বাড়ানোর মতলব।

যাবার সময় হালদার শাঁসিয়ে গেলেন,

—সেজবাবুর কানে তুললে নির্ঘাৎ মারা পড়বি। তোকে আর এখান থেকে ফিরে যেতে হবে না। মনে রাখবি, আমি হালদার ঠাকুর, তোর মতো অনেক বিটলে বামুন চড়িয়েছি।

রামকৃষ্ণ গায়ের ধূলো ঝেড়ে উঠে বসলেন। কাউকে কিছু বললেন না। অযথা কোলাহল করে কি লাভ! সব মানুষ কি আর সমান হয়। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই কি আর ব্রাহ্মণ হওয়া যায়?

কথাটা কিন্তু গোপন রইল না। রাণীর কানে গেল। মথুরবাবুও শুনলেন। রাসমণি মথুরনাথকে বললেন—

—এ অন্যায়ের বিহিত তোমায় করতেই হবে। রামকৃষ্ণের পা ধরে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে। নতুবা······

—আপনি ব্যস্ত হবেন না মা। আমি এখনও জীবিত।

মথুরবাবু বেরিয়ে আসেন। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি রামকৃষ্ণের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—এ সব কি শুনলাম ঠাকুর? হালদার আপনাকে লাথি মেরেছে? আজ ওর মাথা কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব তবে আমার নাম মথুর।

রামকৃষ্ণের মনে কেনো ক্ষোভ নেই। কোনো দুঃখ নেই। তাঁর মুখে প্রশান্তির হাসি।

—এত চটছো কেন সেজবাবু?

—আপনার গায়ে হাত। আমি ওকে হত্যা করবো।

মথুরবাবু ভীষণ রেগে গেছেন। যাঁকে ইষ্ট-জ্ঞানে ভক্তি করেন তাঁর গায়ে পা তুলেছে!

—তাইতো তোকে বলিনি আমি। যাই করে থাক, লোকটা রাগের বশে করে ফেলেছে। রাগ পড়লে বুঝবে তখন। ও রাগলো বলে কি আমরাও রাগবো?

রামকৃষ্ণ শান্ত স্নিগ্ধ হাসিতে মুখখানা ভরে তুললেন।

মথুরবাবুর ক্রোধ শান্ত হতে চায় না।—এর চেয়ে আমাকে দুঃখ দিলে আমি ওকে তবু ক্ষমা করতে পারতাম। আপনি আমাকে নিষেধ করবেন না। ও জানে না কি চরম অন্যায় ও করেছে।

রামকৃষ্ণ মথুরবাবুর গায়ে শ্রীহস্ত বুলিয়ে দিলেন।

—সেজবাবু, মানুষের মানুষকে ভালবাসাই হলো একমাত্র ধর্ম, সাধন, ভজন সব। শত্রুকে বশ করবে ভালবাসা দিয়ে। ক্রোধকে দমন করতে হয় প্রেম দিয়ে। তুমি ওকে ক্ষমা কর। নতুবা আমি দুঃখ পাবো খুব।

হালদারকে আর শাস্তি দেওয়া হলো না মথুরবাবুর। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন তিনি রামকৃষ্ণকে। ছোট ভটচায মানুষ নয়, দেবতা, অবতার।

॥ ষোল ॥

রামকৃষ্ণকে দিয়ে আর নিয়মিত মন্দিরের পুজো চালানো সম্ভব নয়। তিনি দেবীর পুজোর দিকে লক্ষ্য রাখবেন কি, এখন তাঁর যে অবস্থা তাঁর উপরেই লক্ষ্য রাখা ভীষণ প্রয়োজন। কেবল সর্বক্ষণ মা-মা। কখন কোথায় পড়ে থাকেন খেয়াল নেই। তিনি এখন সমস্ত কাজের বাইরে। দেহ ভীষণ ভেঙে পড়েছে।

আবার পুরোদমে তাঁর চিকিৎসা শুরু হলো। গঙ্গাপ্রসাদ সেন এলেন। যার জন্য রাণীর এত আয়োজন, এত দুশ্চিন্তা, তিনি

একেবারে নির্বিকার। কোনো কিছুই গ্রাহ্য করেন না। যে যা করে আপত্তিও করেন না।

দেবীর মন্দিরে নতুন পূজারী এলেন। রামকৃষ্ণের খুড়তুতো ভাই রামতারক চট্টোপাধ্যায় ভার নিলেন মায়ের পূজার। রাণী নিশ্চিন্ত হলেন। ভালই হলো। ঠাকুরের লোক পাওয়া গেছে। রামকুমার এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর দেবীর ভার নিলেন গদাধর। এবার তাঁর ছোট ভাই রামতারক নতুন পূজারী হয়ে এলেন। সংগে ভাগ্নে হৃদয় রইলো। রামকৃষ্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ইনিই পূজারী থাকবেন।

সবাইয়ের দৃষ্টি এখন রামকৃষ্ণের ওপর। মথুরবাবু সাবধান করে দিয়েছেন—ছোট ভটচাযের ভালমন্দ কিছু হলে, তিনি একজনকেও মন্দিরে রাখবেন না। সবাইকে দূর করে দেবেন। মথুরবাবু নিজে খোঁজ-খবর নেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের দৃষ্টি নেই কারোর উপর। তাঁর যা কিছু আলাপ, মান, অভিমান, পরামর্শ সব মায়ের সংগে।

প্রায় একমাস হলো রামতারক মায়ের পুজো করছেন। তিনিও ভাইয়ের উপর নজর রেখেছেন। এখন বেশ নিয়ম-রীতি মেনে পুজো হচ্ছে। মন্দিরের কর্মচারীরা খুশী। হঠাৎ দেশ থেকে খবর এলো, তাঁর ছেলে মারা গেছে। রামতারক দেবী-পুজো ছেড়ে দিলেন। তিনি রাধা গোবিন্দজীর পুজোর ভার নিলেন এর পর থেকে। অগত্যা হৃদয়ের উপর মায়ের পুজোর ভার পড়লো।

ব্যবস্থাটা হৃদয়ের মনঃপুত হয়। বেশকারী থেকে পূজারী হলেন, পদোন্নতি হলো হৃদয়ের।

যতদিন যেতে লাগল ততই রাণী ও মথুরবাবু আরো বেশি করে ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগলেন। রাণী ভাবেন—ছোট ভটচায কি ভালো হবেন না? মন বলে, নিশ্চয়ই হবেন। গদাধর আবার সুস্থ হবেন আগের মতো। রাণী নির্দেশ দিলেন—যত খরচ হয় হোক, ছোট ভটচাযের চিকিৎসা যেন বন্ধ না থাকে।

ঠাকুর জানবাজারে মথুরবাবু যে ঘরে শুতেন, সে ঘরেও তিনি

মাঝে মাঝে রাত কাটাতেন। রাণী যদি ঠাকুরের প্রতি এত আকৃষ্ট না হতেন, তাহলে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হতো রামকৃষ্ণকে। রাণীর ভয়ে ইচ্ছে থাকলেও কেউ গদাধরের উপর অত্যাচার করতে সাহস করতো না। মনে মনে তাঁকে অন্যান্য কর্মচারীরা খুব হিংসে করতো।

দক্ষিণেশ্বর তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল। সারা পৃথিবীর কাছে পরিচিত হলো সে। দক্ষিণেশ্বর হলো সিদ্ধপীঠ। গদাধর এখানে সিদ্ধিলাভ করে ঠাকুর রামকৃষ্ণ হলেন। এখানেই অবিশ্বাসী নরেন স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে বিশ্বজয় করেন। পাশ্চাত্য জগতের লোক চমকে উঠল। ভগ্নী নিবেদিতা এলেন ভারতের দুহিতা হয়ে।

এ মন্দির তৈরী করে গদাধরকে সহায়তা করে রাণী রাসমণি স্মরণীয় হলেন। জানবাজারের মাহিষ্য জমিদার বংশ ধন্য হলো। গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবনের মতো পূর্ণ ক্ষেত্র হলো দক্ষিণেশ্বর।

সবই রাণী রাসমণির পুণ্য কর্মের ফল। সার্থক হলো রাণী রাসমণির দান ও উদ্যম, সার্থক হলো মথুরবাবুর চেষ্টা ও যত্ন, ধন্য হলো ভারতবর্ষ যুগবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে। লোকে বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে ঠাকুরের পায়ে শরণ নিতে ছুটে এল দক্ষিণেশ্বরে। তৃপ্ত হলো ঠাকুরকে দর্শন করে, মন্দিরের মাকে দর্শন করে, অমৃতের স্বাদ পেয়ে।

রাণী এখন প্রায়ই আসেন ঠাকুর বাড়িতে। ছোট ভটচাযের গান শোনেন। গান তো নয় যেন সুধার-ধারা। রাসমণি গান শুনতে শুনতে অন্য জগতে চলে যেতেন। ভাব-সাগরে ডুবে যেতেন।

রাণী আজ দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। গঙ্গায় স্নান করে পবিত্র হয়ে এলেন। মাকে দর্শন করতে মন্দিরে যাবেন। বিষয়-কর্মের কালিমা সব গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন। রাসমণি প্রণাম করে মার মূর্তির সামনে এসে আহ্নিকে বসলেন।

ছোট ভটচায সামনে বসে মার নাম গান করতে থাকেন। গেয়ে চলেছেন গঙ্গার স্রোতের মতো। গদাধর ভাবে বিভোর হয়ে

গেলেন। হঠাৎ রামকৃষ্ণর গান বন্ধ হয়ে গেল। সুর বাজতে বাজতে যেন চট করে সেতারের তার ছিঁড়ে গেল। ঠাকুর ধমকে উঠলেন। —এখানেও ঐ ভাবনা, ঐ চিন্তা।

কর্মচারীরা অদূরে ভিড় করেছিল। পাগল ঠাকুর সকলকেই চমকে দিলেন। কাকে ধমকালেন তিনি? কর্মচারীরা মন্দিরে অন্য কাউকে আর দেখতে পায় না। সামনে তো রাণী মা বসে। রাণীমাকেই বুঝি ধমকালেন পাগল ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ শুধু ধমকেই চুপ করলেন না, রাসমণির পিঠে একটা চড়ও মেরে বসলেন। তিনি যেন তাঁর অবাধ্য শিষ্যাকে শাসন করলেন। কর্মচারীরা হৈ হৈ করে উঠল। সর্বনাশ, পাগল ঠাকুর কার গায়ে হাত দিয়েছে।

কর্মচারীরা দৌড়ে এল। এর একটা বিহিত করা দরকার। তাদের মধ্যে কয়েকজন মথুরবাবুকে খবরটা দিতে গেল। সেজবাবুর হুকুম—ছোট ভটচায যাই করুক, তোমরা কিছু বলবে না। শুধু আমাকে জানাবে। তাই তারা জানাতে ছুটলো। এত বড় একটা ঘটনা কি না জানিয়ে থাকা যায়? বড় লোকের মেজাজ খুশী হতেও সময় নেই, আবার বিগড়াতেও দেরী হয় না। এবার পাগল ঠাকুর গেল। আর নিস্তার নেই। অনেক পাগলামো তাঁরা এতদিন সহ্য করেছে। পাগলকে প্রশ্রয় দিলে শেষ পর্যন্ত এরকমই হয়। কী সাংঘাতিক অপমান! ভাবলেও গা শির শির করে।

রাণীর দাসী, চাকর, কর্মচারি, দারোয়ান যে যেখানে ছিল হৈ হৈ করে ছুটে এল। হৃদয় আর রামতারক অসহায়ের মতো একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রামকৃষ্ণের মুখে প্রশান্ত হাসি। রাণী মাথা নীচু করে বসে আছেন, অনুতাপে তাঁর অন্তর জ্বলে যাচ্ছে। কোনো বিকার নেই দু'জনের মধ্যে। জগজ্জননীর সামনে বসে একি ভাবছিলেন তিনি। রামকৃষ্ণ অন্তর্যামী। সব জেনে তাঁকে শাসন করেছেন। বিপথ থেকে তাঁকে টেনে আনলেন।

বড় স্নেহ করেন তাঁকে। এইতো গুরুর কাজ। রাণী হাত তুলে সকলকে সরে যেতে বললেন।

—চুপ করে তোমরা সবাই দূরে থাকো।

কর্মচারীরা খুব ক্ষেপে গিয়েছিল। তারা পিছু হটতে যেন রাজী নয়।

রাণী তখন সকলকে উদ্দেশ করে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

—ভটচায মশায়কে কেউ কিছু বললে, আমি তাকে ভীষণ শাস্তি দেব। মায়ের সামনে পূজোয় বসেও আমার মন বিষয়-চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল। ভটচায অন্তর্যামী। মনের কথা টের পেয়ে আমাকে শাসন করেছেন। ভটচায আমার গুরু। তাঁকে কেউ কিছু বললে আমি শক্ত হাতে তার বিধান করবো।

মথুরবাবুও এসে উপস্থিত হলেন একটু পরেই। তাঁর কানে খবরটা বেশ বিরাট হয়ে পৌঁছেছে। বোধ হয় তিনি রাণীমাকে গিয়ে আর জীবন্ত দেখবেন না। পাগল ঠাকুর খুব ক্ষেপে গেছে। বেদম প্রহার করেছেন তিনি রাণীমাকে। জীবিত থাকলেও এখন অনেকদিন ডাক্তার বাড়ি দৌড়াতে হবে।

মথুরবাবু এসে সব শুনলেন রাণীর কাছ থেকে। তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছিলেন। তিনিও সেই একই নির্দেশ দিলেন কর্মচারীদের।

কর্মচারী, দাস-দাসী সকলেই অবাক হলো খুব। রাণীর গায়ে হাত দিয়েও ভটচাযের কোনো শাস্তি হলো না। তাঁকে কিছু বলতে পারা যাবে না। কি জানি বড়লোকের কি খেয়াল! এবার যদি তাদেরকেও লাঠি পেটা করে তখনও মুখ বুজে সইতে হবে। কিছু বলা যাবে না।

অবাক হলেন হৃদয়, অবাক হলেন রামতারক।

রামকৃষ্ণ বলতেন—রাসমণি হলেন মা জগদম্বার অষ্ট-সখীর এক সখি। আট শক্তির এক শক্তি। রাসমণিকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। শ্রদ্ধাও করতেন। এত তেজ, এত দয়া, এত রূপ সাধারণ মানুষের হয় না।

দক্ষিণেশ্বরে বহু গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তির আগমন হতে লাগল। ঠাকুর রাণীর আশ্রয়ে নিজের সাধন পথে এগিয়ে চললেন। তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণ তাঁর সহায় হলেন। এক রামাইত সাধু এলেন দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণ জটাধারী সাধুর কাছে নিলেন রামমন্ত্রে দীক্ষা। সর্বধর্ম সমন্বয়। তোতাপুরীর কাছ থেকে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করলেন। সুফি গোবিন্দরাম এলেন রামকৃষ্ণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিতে।

১২৬৮ সালের ৮ই ফাল্গুন। রাণী দক্ষিণেশ্বরের দানপত্র স্বাক্ষর করলেন। মানসিক দিক থেকে নিশ্চিন্ত হলেন তিনি।

কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন রাসমণি পড়ে যায় মেঝেতে। ততটা তখন খেয়াল করেন নি। তেমনি ব্যথা তো লাগেনি। পড়ে গেলে কি হবে তেমন। গ্রাহ্য করেন নি প্রথমে। কাজের মানুষ, আবার কাজের মধ্যে ডুবে যান। কিন্তু জ্বর হয় রাসমণির।

জ্বর মানুষেরই হয়। তার জন্য ভাবনার কি আছে? জ্বর হয়, কমে আবার হয়, আবার কমে, রাণী গ্রাহ্য করেন না, ওষুধও খান না।

রাণীর শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। বয়সও হয়েছে। পেটের দোষ হলো। একটু বেশি রকমের দাঁড়াল। ডাক্তার দেখে বলে গ্রহণী রোগ।

চিকিৎসা শুরু হলো। কিন্তু কোনো উপশম নেই। মথুরবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাণীও এবার চিন্তিত হলেন। ডাক্তার-কবিরাজ আসল। ওষুধ দিয়ে যান। আশ্বাস দেন। কিন্তু রোগ কমছে না। ওষুধে কোন উপকার হয় না। সুলক্ষণ দেখা যায় না। ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়েন রাণী।

রাসমণি বুঝতে পারেন। তাঁর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তাই সবার আগে দক্ষিণেশ্বরের দানপত্রটি ঠিক করে ফেললেন। তবু রাণীর মনে একটা বিরাট দুঃখ রয়ে গেল। কেউ কোনদিন তাঁর বিরোধিতা করেনি। বড় মেয়ে পদ্মমণি গোঁ ছাড়লেন না। তিনি উইলে স্বাক্ষর করলেন না। মা কি সবই দান-ধ্যান করে তাঁদের পথে

বসিয়ে যাবেন। অন্তিমশয্যায় শুয়েও রাসমণির মনে তাই শান্তি নেই।

রাণী বললেন মথুরনাথকে।

—আমাকে কালীঘাটে নিয়ে চল। মায়ের পায়ের কাছেই শেষ নিঃশ্বাস পড়ুক।

মথুরবাবু কোনো দ্বিরুক্তি করলেন না। দেরী করলেন না তিনি একটুও। রাণীকে কালীঘাটের বাড়িতে আনা হলো।

একথা রাসমণি তো বলবেনই। কালীঘাট মায়ের এক পীঠস্থান। মায়ের অষ্ট সেবিকার একজন তিনি।

দৈনিক কত লোক আসে। রাণীর পরিচিত লোকের সংখ্যাও কম ছিল না। একে একে সকলে আসেন। অন্যরা রাণীর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের চোখে-মুখে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা—রাণীমা কেমন আছেন?

শান্তিস্বস্ত্যয়ন করা হলো। হোম, যাগ-যজ্ঞ, পূজা-পাঠ অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি হলো না। কিন্তু রাণীর শারীরিক উন্নতি আর হলো না।

কালীঘাটে সেবার মেলা ছিল একটা। হয়তো কোনো যোগ ছিল। রাসমণির কুশল সংবাদ শোনবার জন্য বাড়ির সামনে ভিড় জমে যায়। তিনি ছিলেন সকলের রাণীমা। কেউ বা আসে হেঁটে কেউবা গাড়ীতে, কেউবা আসে পাল্কীতে। সকলের মুখে এক প্রশ্ন—রাণীমা কেমন আছেন?

মথুরবাবু মায়ের মতই শ্বাশুড়ির সেবা করে চলেন। তিনি মাথার কাছে বসে থাকেন। দুঃখটা তাঁরই বেশি। তিনি নিজের মায়ের মতই ভালবাসতেন রাণীকে। সম্পর্কটা খুব মধুর।

মথুরবাবু এবাড়ির আজ সেজ জামাই। তিনি প্রথমে এসেছিলেন মেজজামাই হয়ে। স্ত্রী মারা যান। মথুরবাবু তখন চলে যেতে চেয়েছিলেন। কেন থাকবেন আর শ্বশুর বাড়িতে; যার জন্য থাকা তিনি চলে গেলেন।

কিন্তু রাসমণি ছাড়লেন না। রাণী ভালবেসে ফেলেছিলেন। ছেলে নেই। ছেলের মতই স্নেহ করতেন এই জামাইকে। মথুরনাথ চলে গেলে তাঁর ডান হাতটা ভেঙে যাবে। সেজ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন মথুরবাবুর। আবার নতুন করে আর এক প্রীতির বাঁধনে বাঁধলেন মথুরনাথকে। এ বাঁধন খোলা পড়েনি।

সেই শাশুড়ি আজ মৃত্যুশয্যায়। মথুরবাবুর মনে হলো সব হারাতে বসেছেন। পরামর্শের প্রয়োজন হলে কার কাছে যাবেন? কে মায়ের মতো স্নেহ দিয়ে আড়াল করে রাখবে তাঁকে।

ক্রমশই মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসে। রাণীমা তো যাবেনই, যে কদিন নিজেদের সেবাযত্নে ধরে রাখা যায়। বাঁচার আর কোনো আশা নেই।

নবম দিন বুঝি আর কাটতে চায় না। জামাইরা বিষণ্ণ-বদনে শিয়রের কাছে বসে রয়েছেন। আর মেয়েরা মায়ের পায়ের কাছে বসে নীরবে চোখের জল ফেলছেন। এরকম মা ক'জন মেয়ের ভাগ্যে হয়।

রাণী জ্ঞান হারাননি। তিনি সজ্ঞানে আছেন। গুরু পুরোহিতের পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন। মায়ের নির্মাল্য মাথায় রাখলেন। ছোটদের আশীর্বাদ করলেন। সান্ত্বনা দিলেন।

রাণীর অবস্থার কথা সহরে ছড়িয়ে পড়ে। না, আর কোনো আশা নেই। আজ টিকবেন কিনা সন্দেহ। লোক আসতে শুরু করে। বিষণ্ণ মুখে রাণীকে দেখতে আসে তারা, কোনো কোলাহল নেই, কোনো গুঞ্জন নেই। স্তব্ধ, বিষণ্ণ মৌন সকলে।

চরম উৎকণ্ঠা আর আশঙ্কার মধ্য দিয়ে সারাটা দিন কেটে গেল। ঘড়িতে রাত আটটা বাজলো। বাড়ির আনাচে-কানাচে কোথাও একটুও অন্ধকার নেই। বাড়ির সব আলো জ্বলছে। অন্ধকারকে বাড়ি থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছে যেন। দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল সমস্ত বাড়িটা।

রাসমণি চোখ বুজে আছেন। সবাই উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে

আছেন তাঁর দিকে। বোধহয় কারোর পলক পড়ছে না। কি জানি যদি সেই পলকের মধ্যেই রাণীমা দেহত্যাগ করেন। কারোর কোন কাজের তাড়া নেই। সব কাজের বড় কাজ রাণীর শেষ সময়টির জন্য নীরবে প্রতীক্ষা করা।

ধীরে ধীরে ঘড়ির কাঁটা এগোতে থাকে। রাত বাড়তে থাকে। হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য রাণী চোখ মেললেন। তাকালেন তিনি সকলের দিকে। সবাই ঝুঁকে পড়েন কথা বলার জন্য। রাসমণির শেষ কথা—কি হবে, পদ্মমণি তো উইলে স্বাক্ষর করলে না।

আবার পর মুহূর্তে চোখ বন্ধ করলেন রাণী। আলো আর ভালো লাগছে না। কাতরকণ্ঠে বললেন,

—আলো নিভিয়ে দে। ওসব রোশনাই আর ভালো লাগছে না। এখন আমার মা আসবেন। আমি তাঁর দিব্যজ্যোতি দেখতে পাচ্ছি।

মায়ের সেবিকা মাতৃমূর্তির দর্শন পেলেন সজ্ঞানে। প্রিয় সেবিকাকে স্বর্গলোকে নিয়ে যেতে দেবী নিজে এসেছেন। রাত গভীর হলো। রাণী স্থির হলেন। মহাপ্রস্থানের পথে পা বাড়ালেন রাসমণি।

শোকে মুহ্যমান সকলে। বাংলার আকাশ থেকে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে গেল। একটি অগ্নিশিখা নির্বাপিত হলো।

রামকৃষ্ণ ধ্যানে আত্মমগ্ন ছিলেন তখন। তিনি আছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের দিব্যদৃষ্টির সামনে একটি মূর্তি হঠাৎ ভেসে উঠলো। রামকৃষ্ণ স্পষ্ট করে তাকালেন।

— কে ?

—আমি বাবা,

রাণী রাসমণি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

রামকৃষ্ণ বুঝলেন সব। শিব শিব বলে যুক্ত কর নিজের কপালে ঠেকালেন।

পরের দিন ভোরে মথুরবাবু এলেন দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণ গঙ্গার

তীরে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন। রাণী আর মর্তলোকে নেই। মথুরবাবুকে দেখে রামকৃষ্ণ বললেন,

—আমি জানি।

রামকৃষ্ণ গেয়ে উঠলেন—

"ভেবে দেখ মন কেউ কারুর নয় মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে
ভুলো না দক্ষিণা কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে॥"

রাণী রাসমণির অতি প্রিয় গান।

মথুরবাবু বিস্মিত হলেন না। রামকৃষ্ণ জানবেনই তো, তিনি যে অন্তর্যামী। তিনি যে দেবতা। তাঁর মুখ দিয়ে কথা সরলো না বেশি।

রাস্তার হু'ধারে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। সবাই শেষবারের মতো রাণীকে একবার দেখবে। রাণীর শেষ যাত্রা। আদি গঙ্গার পুণ্য-তীরে নিয়ে যাওয়া হবে। ধীরে ধীরে বাহকেরা এগিয়ে চলেন। কতটুকুই বা পথ। কিন্তু মানুষের ভিড় ঠেলে এগোতে হবে আজ। সময় লাগবে।

পালঙ্কে শুয়ে আছেন মহারাণী। ফুলে ঢাকা পড়ে গেছে তাঁরা দেহ। শুধু শ্বেত চন্দনে সাজানো মুখখানা ফাঁকা রয়েছে। একটু একটু করে এগোচ্ছেন। নাম কীর্তন হচ্ছে। হচ্ছে মায়ের নাম। মুঠো মুঠো খই, আর টাকা-পয়সা ছড়ানো হচ্ছে।

আদি গঙ্গার কূলে জ্বলে উঠলো অগ্নিশিখা। ধীরে ধীরে রাণীর নশ্বর দেহ সর্বগ্রাসী অনল গ্রাস করে ফেললো। অমর রাণীর আটষট্টি বছরের দেহটি নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে গেল।

কিন্তু রাণী কি নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে গেছেন আমাদের মন থেকে?

কোন রাজবংশের মেয়ে বা বউ না হয়েও তিনি ছিলেন সেকালের রাণীমা।